হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প : নারী-জীবনের রূপায়ণ

শিরিন আক্তার সরকার*

বাংলাদেশের ছোটগল্পের অঙ্গনে হাসান আজিজুল হক অনন্য ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের যে নবযাত্রা ঘটেছিল তার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন হাসান আজিজুল হক। উত্তাল চল্লিশের দশকের প্রবেশমুখে রাঢ়বঙ্গে জন্ম নেওয়া এই খ্যাতিমান কিংবদন্তিতুল্য কথাশিল্পী দেশে-বিদেশে ঈর্ষণীয় আকর্ষণ কেড়েছেন পাঠক-সমালোচকের, অতিক্রম করেছেন একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি। তাঁর হাতে বাংলা ছোটগল্পের বাঁকবদল ঘটেছে। জীবন ও পরিবেশের অভিজ্ঞ রূপভাষ্যকার তিনি। জীবনকে তিনি দেখেছেন সৃষ্টির নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে। তাছাড়া :

> কল্পনাসর্বস্ব জীবনানুভূতি তাঁর মননে কোনো প্রভাব সঞ্চার করতে পারেনি। ফলে তাঁর গল্পগুলো বস্তুবাদী জীবন চেতনায় ভাস্বর। বস্তুবাদী চেতনার প্রকাশ-কল্পে হাসান আজিজুল হল তাঁর ছোটগল্পে সমাজ-জীবনের হতাশা, অবক্ষয়, দারিদ্র্য এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতায় নিষ্পিষ্ট নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের আর্তি, বিক্ষোভ ও প্রতিরোধকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন।(আজহার, ১৯৯৬ : ৩৪৬)

নরম কাদা-জলে যে অবয়ব নির্মাণ করা হয় তাকে ভালোভাবে না পোড়ালে সেটি যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু কেউ কেউ আছেন যিনি পোড়ামাটি দিয়েই আকার বা প্রতিকৃতি নির্মাণে নৈপুণ্য দেখান এবং এটি এরকম পোড়ামাটি যে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করলেও ভাঙতে চায় না। হাসান আজিজুল হক হলেন সেইসব পোড়ামাটির শিল্পীদের একজন যাঁদের জীবনের পাটাতনে লুকিয়ে আছে ভূমিচ্যুত মানুষের বেদনা, লুকিয়ে রয়েছে উদ্বাস্তু অভিবাসী মানুষের গভীর মর্মযন্ত্রণা। বলা যেতে পারে :

> উত্তরবাংলার গ্রামীণ জনপদের ভাঙন, সামাজিক শোষণ, কখনো প্রতিবাদ, বাঁচার সংগ্রাম — এইসব কথা নিয়ে হাসানের গল্পজগৎ। তাঁর সব গল্পেরই মূলে আছে, বাঁচা জান্তবভাবে বাঁচা, শিশ্নোদরপরায়ণভাবে বাঁচা, স্থূলতম শারীরিকভাবে বাঁচা

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

> এবং সেই বাঁচার ন্যূনতম অস্তিত্বের নানান চেহারা, আর তার থেকে মুক্তির রূপও হরেক রকম। আর তা থেকে পরাজয়ের রূপও হরেক রকম। টিকে থাকার, বাঁচার, হেরে যাওয়ার বিস্বাদ, কটু, প্রায় নিয়তিবাদী উপলব্ধি, শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায় 'নিরুচ্ছ্বাস আর্তি' নিয়ে গড়ে উঠেছে হাসানের ধ্রুপদী বিশাল গল্পভুবন। (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ১৮৪)

হাসান আজিজুল হকের গল্পে আছে তিনটি পর্ব। প্রথমত, প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ যখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামের বাসিন্দা। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ-পর্ব, যে সময়ে লেখক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন আর শেষ পর্বটি তাঁর বর্তমান পর্ব বা উত্তরকাল-পর্ব — যে পর্বে এখন তিনি নতুন করে আবার তাঁর আখ্যানশৈলীর ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। ঐতিহাসিক উত্তেজনা-আবেগ, সংকট এবং ভিন্ন দুই রাষ্ট্রের ব্যাপক মানুষের অনিশ্চিত মানবেতর জীবনের কালো অন্ধকার হাসান আজিজুল হকের গল্পে যেমন নির্মম আবেগহীনতায় রূপায়িত হয়েছে তেমনি রাঢ় মৃত্তিকার রুক্ষ আঞ্চলিক জীবন, সামন্ত জীবনের নিগড় ছিঁড়ে গোষ্ঠী জীবনের উদ্ভাস, সাম্প্রদায়িক হিংস্রতায় ক্ষতবিক্ষত সংখ্যালঘু মানুষের প্রাত্যহিক অস্তিত্ব তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিসরে শিল্পিত হয়েছে। রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণে লেখক যেমন প্রবেশ করেছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনমূলে, তেমনি নির্মোহ তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন পরিবর্তিত সমাজ ও সময়স্বভাবকে। সময় ও সমাজ-বিধৃত নরনারীর দুর্মর অস্তিত্ব এবং তার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছেন, কখনো-বা সরল বর্ণনার অনবদ্য আবেদনে উন্মোচন করেছেন মানবচরিত্রের বহুমাত্রিকতা। অভিজ্ঞতার নানামাত্রিক অনুভবজ্ঞানের জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর গল্পের পরতে পরতে। লেখার মধ্য দিয়েই হাসান আজিজুল হক জনসাধারণের অধিকার আদায়ের পক্ষে আপন ভূমিকা নির্ধারণ করেছেন গভীর দায়িত্ব বোধের আলোকে। লেখার মধ্য দিয়ে ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের বিচিত্র অবয়বে প্রকারান্তরে বঞ্চিত-অবদমিত অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকারই ব্যক্ত করেছেন হাসান আজিজুল হক। লেখকের কাজ দেখা, তাঁর জটিল অভিজ্ঞতার বিশাল, অস্পষ্ট ও নিদারুণ বিশৃঙ্খল জগৎটিকে লেখায় অবয়ব দিয়ে হাজির করাটাই হলো লেখার কাজ, সৃষ্টির কাজ। লেখক হাসান আজিজুল হকের জবানীতে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে :

> এরকমভাবে লেখার ভিতর দিয়ে তৈরি হয় বাস্তবের সমান্তরাল বাস্তব, জীবনের প্রতিরূপ জীবন। যে-বাস্তব থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ করি, সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই নির্মাণ করি দ্বিতীয় বাস্তব। এই দ্বিতীয় বাস্তব— লেখার বাস্তব— মূল বাস্তবের প্রতিরূপ ছায়া; অলীক নয়, মিথ্যা বা মায়া নয়। তা মূল বাস্তবের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে, আর নতুন নতুন মাত্রা নির্মাণ করে, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয় বাস্তবেরই ভিতরে। (হায়াৎ, ২০১১ : ৫৫)

বলা যেতে পারে সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সমান্তরালে স্বাভাবিক বা অনিবার্য প্রভাবেই হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চিত্রায়ণ ঘটেছে। সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন ও সংশোধনকল্পে হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের স্বরূপ-উন্মোচন প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত। হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে বিধৃত নারী-জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর *রচনাসংগ্রহ-১* ও *রচনাসংগ্রহ-২*-এর অন্তর্ভুক্ত মোট আটটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলোকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আটটি গল্পগ্রন্থে সব মিলিয়ে পঞ্চান্নটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলো লেখকের সমৃদ্ধ-অভিজ্ঞতা, প্রখর মেধা ও সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের সার্থক চিত্রায়ণ। বর্তমান নিবন্ধে হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। অতএব, হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারী-জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর যে-সব ছোটগল্পে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চিত্রের প্রতিফলন ও উন্মোচন ঘটেছে, কেবল সে-সব ছোটগল্পই এখানে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য

হাসান আজিজুল হকের প্রথম গল্পগ্রন্থ *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য*। গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মোট দশটি গল্প। গল্পগুলো যথাক্রমে 'শকুন', 'তৃষ্ণা', একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে', 'উত্তর বসন্তে', 'বিমর্ষ রাত্রি : প্রথম প্রহর', 'মন তাঁর শঙ্খিনী', 'সীমানা', 'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী', 'আবর্তের সম্মুখে' এবং 'গুনিন। গল্পগুলোর অবয়বে "বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির আলোয় তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজজীবনের বহুমাত্রিক অবক্ষয়, শোষিত-ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার ও বঞ্চনা, কখনো-বা তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনী।" (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ১৮৩) সামাজিক অবক্ষয়ের আসল কারণ যে আর্থ-রাজনীতিক জীবনের নানা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে— তার আভাসও কোনো কোনো গল্পের বিচিত্র পরিসরে রূপায়িত হয়েছে। হাসান আজিজুল হক প্রথম পর্বের গল্পে যৌনতা এবং মানুষের আদিম কামনার শিল্পভাষ্য নির্মাণে ছিলেন উৎসাহী। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে তাঁর গল্প মোটামুটিভাবে যৌন সর্বস্বতাবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও প্রকারান্তরে এর মধ্য দিয়ে : "ব্যক্তির যৌন জীবনের পদস্খলন যা আমাদের সমাজের মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে পাপাচরণের নামান্তর মাত্র— হাসান তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হবার চেষ্টা করেছেন।" (জাফর, ১৯৯৬ : ২৯) একই সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে বিরূপ সময় ও সমাজবন্দি নরনারীর অন্তর্জাগতিক জটিলতা এবং তার অবচেতনার বহুভুজ রহস্যময় প্রবৃত্তির নানামাত্রিক চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা, নারী-পুরুষের অসম সামাজিক পটভূমি, সম্পর্কের বহুতলিক বিন্যাস, নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

— এক কথায় যাপিত জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের বিচিত্র আধারে গল্পগুলো হয়ে উঠেছে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবনঘনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি। গল্পগুলোতে নারী-জীবনের নানামুখী সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নারীর গুহায়িত জীবন-রহস্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তেমনি এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি, সময় ও সমাজের জটিল-মিশ্র জীবন অভিধানের বহুমাত্রিক স্বরূপটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজসত্যের পটভূমিতে।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'শকুন'-এ গ্রামের কয়েকটি ছেলে দিনের আলোয় ফিরতে না পারা একটি শকুনকে নিয়ে সাংঘাতিক খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। তাদের অত্যধিক মত্ততার কবলে পড়ে শকুনটা শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হলো। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তারা সবাই মিলে খেলাচ্ছলে শকুনটির গা থেকে একটি একটি করে সমস্ত পালক খসিয়ে নিয়ে তাকে অসুন্দরের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ছাড়লো। শকুনটা মূর্তিমান একটি কদাকার প্রতীকে পরিণত হলো। গল্পটিতে শকুনটি অত্যাচারী বা নিপীড়নকারীর ভূমিকায় প্রতীকায়িত হয়েছে। সহজতর ভঙ্গিতে লেখক আলোচ্য গল্পের অবয়বে প্রকারান্তরে অবক্ষয়-পীড়িত সমাজের মর্মমূল ধরে নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন। কেবল তাই নয়; গল্পটিতে একই সঙ্গে সময় ও সমাজের অবক্ষয়-পীড়িত অসহ পটভূমিতে নারীর সামাজিক অধস্তনতার করুণ চিত্রটিও শিল্পিত হয়েছে। কিশোর বালকেরা ক্লান্ত শরীরে টলতে টলতে গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই তালগাছ ও ন্যাড়া বেল গাছের আবছা ছায়ায় সাদা মতো কি যেন দেখতে পেলো। সেটা অন্য কিছু নয় — কাদু শেখের রাঁড় বোনের সঙ্গে জমিরুদ্দির অবৈধ যৌন মিলনের ফলে জাত একটি অপূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর অস্পষ্ট দৃশ্য। এক পর্যায়ে কথাটা জানাজানি হয়ে যেতেই দলে দলে গ্রামের মানুষ মৃত শিশুটির পাশে জড়ো হতে থাকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। সবাই আসলেও কেবল দেখা যায় না কাদু শেখের সেই রাঁড় বোনটিকে। গল্পে বিষয়টি রূপায়িত হয়েছে এভাবে :

> ন্যাড়া বেলতলা থেকে একটু দূরে প্রায় সকলের চোখের সামনেই গতরাতের শকুনটা মরে পড়ে আছে। মরার আগে সে কিছু গলা মাংস বমি করেছে। কত বড় লাগছে তাকে! ঠোঁটের পাশ দিয়ে খড়ের টুকরো বেরিয়ে আছে। ... দলে দলে আরও শকুন নামছে তার পাশেই। কিন্তু শকুন শকুনের মাংস খায় না। মরা শকুনটার পাশে পড়ে রয়েছে অর্ধস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনের দল। চিৎকার করতে করতে। উন্মত্তের মত। আশেপাশের বাড়িগুলি থেকে মানুষ ডেকে আনছে মৃত শিশুটি। ... শুধু কাদু শেখের বিধবা বোনকে দেখা যায় না। সে অসুস্থ। দিনের চড়া আলোয় তাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ('শকুন', *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, রচনাসংগ্রহ-১* : ২১)

কাদু শেখের বিধবা বোনকে আলোচ্য গল্পে দরিদ্রঘরের ভাগ্য-লাঞ্ছিত অসহায় নারীর উপায়হীনতা ও অবরুদ্ধ অবদমিত কামনার বিকৃত প্রকাশের অনুষঙ্গে রূপায়িত করা

হয়েছে। যে অবৈধ ও সমাজগর্হিত সম্পর্কের সূত্র ধরে কাদু শেখের বিধবা বোনের নবোজাত শিশুর মৃতদেহের স্থান হয় মৃত শকুনের পাশে, সে অবৈধ সম্পর্কের দায়ভার সম্পূর্ণতই আরোপিত হয় কাদু শেখের বিধবা বোনের উপর, ফলে দিনের আলোয় তাকে দেখা যায় না। মৃত শকুনের মতোই সে ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে। এহেন সম্পর্কে নারীই কেবল বিব্রত বোধ করে থাকে। সমাজ আরোপিত বিধি-নিষেধের যূপকাষ্ঠে নারীকে যতটা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়; একই আচরণের সমঅংশীদার হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের ক্ষেত্রে এ নিয়মের শিথিলতা সহজেই লক্ষণীয়। ফলে গল্পটির কোথাও জমিরুদ্দির বিব্রত বোধ করা বা অসহায়ত্বের সামান্যতম ইঙ্গিতও পরিস্ফুট হতে দেখা যায় না। সমাজ নিরূপিত ন্যায়-অন্যায় বোধের বিবেচনার ক্ষেত্রভূমিতে নারী-পুরুষের অসম বিভাজন রেখাটি এভাবেই আলোচ্য গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গল্পটি হয়ে উঠেছে সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থা ও নারীর প্রতি একপেশে সামাজিক সংকীর্ণ মানসিকতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি।

পরবর্তী গল্প 'তৃষ্ণা'-র পাত্র-পাত্রীর জীবনে কোনো স্বপ্ন নেই, লক্ষ্য নেই, প্রত্যাশা নেই— তারা শুধু দারুণ অবক্ষয়ের গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান। অলস-অবশ ও লক্ষ্যহীন জীবনে অনিবার্যভাবেই কখনো উদগ্র হয়ে ওঠে কামুকতা, কখনো-বা নির্লজ্জ পেটুকতা। এ গল্পে বাশেদ চরিত্রটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক হিসেবে অবধারিতভাবেই জারজ সন্তানের অবাঞ্ছিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বাশেদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে অবক্ষয় পীড়িত সমাজচিত্রটি প্রতিভাত হলেও এরই অবয়বে নারী-জীবনের এক বিশেষ মাত্রার সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় ঘটে। বাশেদ সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত। তার মায়ের স্বীকারোক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> বাশেদের মা অন্ধকার একা ঘরে বিড়বিড় করতে থাকল, আঃ, ছেলেটো ই সংসারে অতিথ গো! ইয়া আল্লা, কত গোনা করলাম আল্লা! মিনষেটো ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার সব্বোনাশ করলে। আমি ছাড়া বাচেদের আর ক্যা আচে? ই সংসারে উ ভাত ক্যানে পাবে? বাচেদের বাপ তো বাচেদের বাপ লয়! ইয়া আল্লা, আমি বুঝতে পারি নাই। সেই মিনষেটোর সাজা দিও, ই বান্দার গোনা লিও না! ('তৃষ্ণা', *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, রচনাসংগ্রহ-১* : ২৪)

বাশেদের মায়ের এই স্বীকারোক্তি প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতায় নারীর অসহায়ত্ব ও পুরুষ কর্তৃক প্রতারিত জীবনচিত্রকেই উন্মোচিত করে তোলে। একই সঙ্গে পুরুষের লাম্পট্য ও ভোগলিপ্সার লোলুপতার দৃশ্যপটটি প্রতিভাত হয়ে সমাজবাস্তবতায় নারী-নিগ্রহের পশ্চাতে নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সঙ্কট ও অসহায়ত্বের স্বরূপটিকেও মূর্ত করে তোলে। সমাজে নারী ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়; এমনকি অক্ষম-অথর্ব পুরুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকেও নারীর মুক্তি নেই— এই সমাজসত্যটি গল্পে বাশেদের দুর্মর যৌনাকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে অসাধারণ শিল্পকুশতায় রূপায়িত হয়েছে এভাবে :

> এই সখি হাসিস না, লোক জানতে পারবে।

> পারুকগো, পয়সা বার কর।
>
> না, আগে–
>
> উঁহু, আগে পয়সা বার কর, তার পর কথা।
>
> আবার রিন্‌রিন্‌ করে হেসে উঠল মেয়ে, দু'আনা লয়, দু'আনা লয়, তিন আনা করে দিতে হবে।
>
> ইঃ, ভারি লাটসাহেব। তিন আনা লাফাইচে।
>
> তবে চললোম।
>
> বাশেদের আবার সেই তীক্ষ্ণ ইচ্ছাটা সূক্ষ্ম তীর হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। ... আমি কিছুতেই মরতে চাই না, মরব না, আমি মরব না, আমি উই ঝোপটার কাছে যাব, সিকিটো ছুঁড়ে দোব সখির আচলে, এই লে, আমি বাচেদ, আমি–। ('তৃষ্ণা', *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, গল্পসংগ্রহ-১* : ৩০-৩১)

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে'র মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে : "সেই একই অসুস্থতা, একই বিকৃতি, একই বিবর্ণ ও বিস্বাদ জীবনের পদপাত।" (জাফর, ১৯৯৬ : ৩১) এক গেঁয়ো মুদি দোকানদার সতীনাথের অসততা আর নারীর সতীত্বনাশে আগ্রহের আরতি শরীরে মেখে বেড়ে উঠেছে গল্পটির কাঠামো ও কাহিনির পরিসর। রায়বাড়ির বিধবার মেঘের মতো ভারী ও ফলবতী রঙের দিকে সতীনাথের লোভাতুর চোখ পড়ে। পানের রঙে ঠোঁট রাঙিয়ে সন্ধ্যার সময় সড়ক ছেড়ে আলপথে উদ্ধতবুকে এগিয়ে আসা ভামিনীর জন্য ঘরদোর-অন্ধকার রাতের প্রয়োজন — সব ব্যবস্থা করে দেয় সতীনাথ। সতীনাথ অশিক্ষিত, বাবার কাছে পরিবারের কাছে 'ভ্রষ্টচরিত্র' কথাটা ছাড়া আর কিছুই শেখা হয়নি তার। সতীনাথের ভাবনার আলোকে আলোচ্য গল্পে সমাজে নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও নারী-পুরুষের মধ্যকার সমাজ নির্মিত অসম বিভাজন ও সামাজিক অসঙ্গতির বাস্তব চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে অবলীলায় :

> সে ভ্রষ্টচরিত্র। আর মেয়েলোকটা নষ্টা। নষ্ট কথাটা শিখেছে যখন তখন ব্যবহার করতে পারার মত। অভ্যাস করে করে। যেমন করে হাঁটতে শেখে, ভাত খেতে শেখে, রাগতে, হিংসা করতে আর গালাগালি দিতে শেখে। শিখেছে যখন বাগ্দীরা বলে, মেয়েটা সতী লয়, লষ্ট। কিন্তু ভ্রষ্টচরিত্র কথাটা শিখেছিলে বাবার কাছে। তোলা কাপড়ের মতো কথাটা। যখন তখন ব্যবহার করা যায় না। নিজেকে বিচার করতে গেলে ভ্রষ্টচরিত্র কথাটা যেন ভালো শোনায়। অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। আমি তো ভ্রষ্টচরিত্র! কিন্তু মেয়েটা যে নষ্টা। ('একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে', *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, রচনা সংগ্রহ- ১* : ৩৬)

অসাধারণ অনুভূতি-প্রখর সত্য উপস্থাপনে এভাবেই সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার অসঙ্গতিকে রূপায়িত করেছেন হাসান আজিজুল হক। অসাধারণ নৈপুণ্যে গল্পটিতে "নারীপুরুষকে বিচারের এই যে ভিন্ন চোখ, সমাজের আর দশটা অনিয়মের মধ্যে

এটাও যে দেখবার কিংবা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখে, সে কথা কী কৌশলে গল্পনির্মাতা হাসান আজিজুল হক তাঁর পাঠককে জানিয়ে দিলেন!" (ফজলুল, ২০১২ : ১৩৬) পরবর্তী গল্প 'বিমর্ষ রাত্রি : প্রথম প্রহরে'র মধ্যে শহুরে বন্ধু জামানকে সঙ্গে নিয়ে গল্পকথকের নিজের গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রাপথের নানামাত্রিক দৃশ্যচিত্রের অবয়বে নির্মিত আখ্যানশৈলী। গল্পকথক ও তার পুরনো বন্ধুর কথোপকথনের সূত্রে বিবৃত হয় গ্রামের পথে যাত্রার উদ্দেশ্য। কথাচ্ছলে জামান তার বিয়ে প্রসঙ্গে গল্পকথককে জানায় :

> একটা মেয়ের খোঁজ-টোজ দাও না হে। বিয়ে করতে হয় এবার। আর কতদিন?
>
> বিয়ে করতে চাও– সত্যি?
>
> কেন বিয়ে কি করতে নেই? অত অবাক হচ্ছো কেন?
>
> আমি একটি পাত্রীর সন্ধান তোমাকে দিতে পারি– যদি তুমি সিরিয়াস হও।
>
> তাই নাকি? কোথায়? তোমার হাতে মেয়ে? বল কি? ...পাত্রী সম্বন্ধে আমার আইডিয়াটা তোমাকে বলি।
>
> তুমি তোমার আইডিয়া আমাকে বলেছিলে। তোমাদের মতো অধিকাংশ শহুরে যুবকরা যে বাহাদুরিটা করে আর কি! শহরের মেয়ে বিয়ে করবে না। বেশি লেখাপড়া জানা আধুনিকা হলে চলবে না। একটু লজ্জাবতী হবে, একটু গ্রাম্য, একটু লেখাপড়া জানা, হরিণীর মতো চকিত নয়না, মেষের মতো সরলস্বভাবা ইত্যাকার কথা। ('বিমর্ষ রাত্রি : প্রথম প্রহর', *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ৬৬-৬৭)

এই কথোপকথনের সূত্র ধরে সমাজে নারীর প্রকৃত সত্তার স্বরূপটি উন্মোচিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত যুবক জামানের এহেন ভাবনা-চিন্তা কেবল পশ্চাৎপদ অবক্ষয়-পীড়িত সমাজ-ব্যবস্থার রুগ্ন-জীর্ণ স্বরূপটিকেই প্রতিবিম্বিত করে তোলে না বরং পাঠকের বোধে জাগ্রত করে সেই সমাজসত্য : "পুরুষ প্রাধান্য নারী নির্যাতনের আদর্শিক ভিত্তি। অবিবেচক, হঠকারী, বিচারবুদ্ধি-বর্জিত, ভাবাবেগ তাড়িত, অস্থিরচিত্ত নারীকে নিজ ইচ্ছায় চলতে দিলে সমাজে বিপর্যয় ঘটে যাবে। কাজেই সমাজের প্রয়োজনে নারীকে বশে রাখতে হবে, নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।" (মাহমুদা, ২০০২ : ২৯) পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এহেন সংকীর্ণতা আলোচ্য গল্পে সমাজবাস্তবতার নিরিখে শিল্পিত হয়েছে।

'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী' নামক গল্পে একজন উচ্চশিক্ষিতা নারী, কৈশোর-উত্তীর্ণ রেজার সঙ্গে, যাঁর ছাত্র-শিক্ষিকার সম্পর্ক— তিনিও কীভাবে এক পর্যায়ে সমাজের প্রচলিত নীতিবোধ ও তাঁর মার্জিত রুচিকে জলাঞ্জলি দিয়ে (নিদ্রিত চার বছরের একটি শিশু পাশে থাকা সত্ত্বেও) রেজার সঙ্গে যৌনসম্ভোগে রত হয়েছিলেন তার নিখুঁত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পে : "রেজার কৈশোর-উত্তীর্ণ-মনোলোকে যৌন চেতনার উদগম

এবং অবসর ক্লান্ত রাহেলার যৌন অতৃপ্তি — শহরের নির্জন-শান্ত গৃহের পরিবেশে উভয়কেই পাপাচরণের প্রান্তসীমায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।" (জাফর, ১৯৯৬ : ৩১) আলোচ্য গল্পে অবক্ষয়ের এক ভিন্নমাত্রাকে নারীচরিত্রের বিচিত্র অবয়বে প্রমূর্ত হতে দেখা যায়। উচ্চশিক্ষিতা ইংরেজি শিক্ষিকা রাহেলার সোৎসাহে সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ তারই ছাত্র রেজার যৌন সংসর্গের এক মূল্যবোধহীনতার ছবি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে গল্পটিতে সমাজবাস্তবতার নিরিখে। রেজার অটুট প্রতিজ্ঞা রাহেলার উপোসি শরীরের টানে ব্যর্থ হয় এবং :

> রাহেলার চার বছরের মেয়ের রাগত, ভীত, তীক্ষ্ণ, ক্রুদ্ধ গর্জনে রেজা তার আহত মুমূর্ষু রক্তাক্ত বিবেককে ডাস্টবিন থেকে তুলে নিয়েছিলো। ...উপোসি রাহেলার শরীর থেকেই কি রেজার এই পলায়ন? সমাজের স্বীকৃতি নেই বলেই কী এই অবক্ষয়? নাকি শেষ পর্যন্ত দুজনে দুজনের কাছে সৎ থাকতে পারছে না, বিশ্বাস রাখতে পারছে না সম্পর্কে। এই পলায়ন, এই আত্মরক্ষা কি রেজার নিজের অস্তিত্বের কাছেও নয়? (দেবশ্রী, ২০১২ : ১৬৮)

স্খলিত ও অধঃপতিত রাহেলা ও রেজার আত্মরক্ষার ভাবানুষঙ্গটি গল্পে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

> দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো। ঠিক তেমনি করে কাঁপা পায়ে উঠে রেজার মুখটা দুহাতে গ্রহণ করে চুমু খেলেন বারবার। ...দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের শেষে যেন ভূমিকম্প হলো। সেই প্রচণ্ড ঝড়টা রেজার পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে এলো। এই প্রথম সে প্রতিচুম্বন করল। দৈত্যের মতো শক্তিতে আঁকড়ে ধরল রাহেলাকে। ছেলেটার অস্থির হাত খুঁজছে, খুঁজছে, যন্ত্রণাবিদ্ধ হাত অস্থির, অস্থির ও অনুসন্ধিৎসু, কম্পমান ও অস্থির ও অনুসন্ধিৎসু। ওর নতুন পাওয়া বিবেক তখন যেন দেহের বাইরে মুহ্যমান হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওরা সেই রক্তাক্ত, আহত মুমূর্ষু বিবেকটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এলো। ('একটি আত্মরক্ষার কাহিনী', *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, রচনাসংগ্রহ-১* : ১০২)

গল্পটিতে কেবল রেজা এবং রাহেলার অনৈতিক সম্পর্কের চিত্রটিই বিধৃত হয়নি বরং এর মধ্য দিয়েই রাহেলা নামক নারীর অসহায়ত্ব ও একাকিত্বের যন্ত্রণার তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে। 'আমি একেবারে একা' কিংবা 'জীবনে তিনি কি চেয়েছিলেন আর জীবন তার পরিবর্তে তাঁকে কি দিয়েছে।' অথবা 'চার বছরের মেয়েকে নিয়ে নির্জন বাড়িতে বসবাস করা' ইত্যাদি বিবৃতির মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে রাহেলার অবয়বে বঞ্চিত-অতৃপ্ত নারী জীবনের হতাশা ও অচরিতার্থতাজনিত যৌন-বাসনার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় একজন পুরুষের মধ্য বয়সে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ কিংবা পরনারীতে আসক্তির মতো আচরণকে যতোটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের প্রবণতা ও মানসিকতা দেখা যায়, ঠিক ততটাই বিরূপ মানসিকতা প্রদর্শিত হয় একই আচরণে অভিযুক্ত নারীর প্রতি। নারী তার অবদমিত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে হৃদয়ে চেপে

রেখে এক অবরুদ্ধ জীবন-যাপন করতে একরকম বাধ্যই হয়। সমাজ নারীকে সুনির্ধারিত কতিপয় নিয়মে বা স্বরূপে দেখতেই অভ্যস্ত করে তোলে। কেবল তাই নয় :

> ট্রাজেডী এই যে, স্ত্রী, মাতা ও কর্মজীবী রমণীর তথাকথিত ভূমিকা তাদের নিজেদের সৃষ্ট ভূমিকা নয়; পুরুষ, পুরুষের নির্মিত কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান এই ভূমিকাগুলোর স্রষ্টা বা নির্মাতা। ... মানুষ হিসেবে নারীও তার মনমানসকে 'নিজ' অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে স্বাধীনচেতা হতে পারে; নারী তার 'নিজ' "Self"-কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু এ পথে প্রতিবন্ধক হল পিতৃতন্ত্র। (মাহমুদা, ২০০২ : ১০০)

স্পষ্টতই লক্ষণীয় যে, একই তথাকথিত সমাজ গর্হিত অনৈতিক আচরণে অংশগ্রহণকারী দুই চরিত্র রাহেলা ও রেজার জন্য উপহাস ও পরিহাসের তীব্রতা সমাজ দুইভাবে নির্ধারণ করে রেখেছে। সমাজ এই ঘটনার জন্য রাহেলাকেই দোষী সাব্যস্ত করতে বেশি আগ্রহী। এমনকি রেজার চরিত্র স্খলনের দায়ভারও প্রকারান্তরে সমাজ রাহেলার উপরই ন্যস্ত করবে। নারীর প্রতি এহেন অসম দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমাজবাস্তবতার এক অতি পরিচিত অনুষঙ্গ। সমাজে নারীর পশ্চাৎপদ অসম অবস্থানের স্বরূপটি আলোচ্য গল্পে রাহেলা চরিত্রের একাকিত্ববোধ ও অসহায় অবরুদ্ধ অতৃপ্ত যৌন-কামনার অন্তরালে শিল্পিত হয়ে উঠেছে।

আত্মজা ও একটি করবী গাছ

হাসান আজিজুল হকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* মোট আটটি গল্পের এক অনবদ্য সংকলন। গল্পগুলো যথাক্রমে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পরবাসী', 'সারা দুপুর', 'অন্তর্গত নিষাদ', 'মারী', 'উটপাখি', 'সুখের সন্ধানে', এবং 'আমৃত্যু আজীবন'। এই আটটি গল্পের মধ্যে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পরবাসী' এবং 'মারী' — এই তিনটি গল্প সাতচল্লিশের দেশ বিভাগোত্তর কালে উদ্বাস্তু ও দাঙ্গাকবলিত জীবনের মর্মবিদারী নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বলা যেতে পারে "আত্মজা ও একটি করবী গাছ' হাসান আজিজুল হকের প্রতীক শিল্পভাবনার এক শক্তিশালী রূপায়ণ।" (আজহার, ১৯৯৬ : ৩৫৫) স্বাধীনতার স্বাদ যে কতো তিক্ত ও বিষাক্ত হতে পারে, এর জ্বালা-যন্ত্রণা যে কতো মর্মন্তুদ হতে পারে, হাসান আজিজুল হক ভারতের মাটি থেকে উন্মূলিত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পূর্ববাংলায় পালিয়ে আসা সহায় সম্বলহীন এক বৃদ্ধ ও তার পারিবারিক জীবনের হাহাকারের মধ্য দিয়ে তা বাঙ্ময় করে তুলেছেন। বস্তুতপক্ষে, গল্পটিতে তেমন কোনো কাহিনি নেই। গ্রামের তিন বখে-যাওয়া যুবক দেশছাড়া এক বৃদ্ধের কন্যাকে ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বেরিয়েছে, পৌঁছেছে তারা বৃদ্ধের বাড়িতে, তাদের যাত্রাপথে টুকরো টুকরো কথামালা ও দৃশ্যচিত্রের অবয়বে ভেসে ওঠা নানামাত্রিক সামাজিক অবক্ষয়ের বাস্তবচিত্র, এবং অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে শাসন করে বুড়ো দুই যুবককে পাঠিয়ে দিলো আত্মজার ঘরে — এই-ই হচ্ছে আলোচ্য গল্পের আখ্যানভাগ। বলা যেতে পারে :

"'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের ঘটনাস্রোত এগিয়ে চলেছে চরিত্রের মনোলোকে — কখনো এনাম-ফেকু-সুহাস, কখনো-বা কেশো বুড়োর মনোলোকের ক্রমভঙ্গুর ভাবনায় এগিয়ে চলেছে শিল্পিতা পেয়েছে আলোচ্য গল্পের ঘটনাংশ।" (বিশ্বজিৎ, ২০১২ : ৭১) সামান্য কয়েক পাতার গল্প, কাহিনি ভেঙ্গে দেখতে চেষ্টা করলে দেখা যায় সে অর্থে কোনো গল্পও নেই। এক সন্ধ্যার কয়েক ঘন্টার অভিজ্ঞতা, এক মফস্বল শহরে — অথবা গ্রামে তিন অকালকুষ্মাণ্ড তরুণের সস্তায় ফুর্তি খোঁজার বিবরণ। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' দেশভাগের পরবর্তী কোন এক সময়ের ঘটনা। নিজের স্থাবর-অস্থাবর সকল সহায়-সম্পদ ছেড়ে দেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে যে সব অগুনতি মানুষকে, এই গল্পের বৃদ্ধ ও তার পরিবার তাদেরই অন্তর্গত। দেশভাগের পর সব খুইয়ে সপরিবারে বৃদ্ধা আশ্রয় নিয়েছে আলোহীন-আশাহীন এক গ্রামে, সেখানে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই আছে বটে, কিন্তু দিনাতিপাতের কোন অবলম্বন নেই। অবশেষে ভর করতে হয়েছে কিশোরী কন্যার ওপর। লজ্জা, ভীতি, ঘৃণা তার চেহারায়, গলার স্বরে প্রতিবিম্বিত হয় এভাবে :

> জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই– ইচ্ছে করলেই কি আর ঘুমানো যায়। ... এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতরে কি ঠাণ্ডা নেই? একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে। ... এই তোমরা একটু আধটু আসো, যখন তখন এসে খোঁজখবর নাও। সময় অসময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা! তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হতো এই জঙ্গুলে জায়গায়। ... এই দ্যাখো না, বড় মেয়েটা, রুকু এখন চা করতে যাচ্ছে তোমাদের জন্য– একটা শ্লেষার দলা শ্বাসনালীটাকে একবারে স্তব্ধ করে দেয়। ('আত্মজা ও একটি করবী গাছ', *আত্মজা ও একটি করবী গাছ, রচনাসংগ্রহ-১* : ১৩৪-১৩৫)

বস্তুত, গল্পটিতে কোনো নীতিকথা নেই, কোনো ইতিহাস পাঠও নেই। অনুক্ত সে সব কথা পাঠক যে যার মতো করে আবিষ্কার করে নেয় গল্প পাঠের মধ্য দিয়ে। আলোচ্য গল্পের কতিপয় উদ্ধৃতি সমাজ-বাস্তবতায় নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপটি অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> ক. মামীর বোনেরা যা সোন্দর সে কথা আর কলাম না। তোর মামার বাড়িটা কোয়ানে, শালীরা বেড়াতি আসলে কস আমাকে– ফেকু কথা না বললেই নয়, তাই বলে। সেটি হচ্ছে না, বুজিচো– চোখ বন্ধ করে মনের আরামে বলল সুহাস। ও, তাই তুমি মাসে পাঁচবার করে ছোট মামার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতি যাচ্ছো? বুজিচি, ওখেনে তো পয়সাকড়ি লাগে না; আরামেই আছো দেহা যায়। – ফেকু চোখ মটকে বলে।
>
> খ. মুরগিগুলো আবার কঁ কঁ করে ওঠে, কথা বলে ওঠে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তীক্ষ্ণ গালাগালি অন্ধকারকে ফাড়ে, চুপ, চুপ, মাগি চুপ কর, কুত্তী– এবং সমস্ত চুপ করে যায়।

> গ. এখানে যখন এলাম– আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই ... তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ– সুহাস হাসছে হি হি হি। ... আবার হু হু ফোঁপানি এলো।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছ থেকে সুহাস, ফেকু ও ইনামের মনোলোকের রুচিহীনতার অন্তরালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায়ত্ব ও দুর্মর যন্ত্রণার অধস্তন সামাজিক রূঢ় বাস্তবতার চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। ইনাম, ফেকু, সুহাসের কথাবার্তা ও মনোচেতনার অবয়বে প্রতিফলিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রচ্ছাপ। তিন যুবকই কথায় কথায় 'শালী' শব্দ উচ্চারণ করে, অর্থাৎ অনবরত বিয়ে করতে চায়। অন্যদিকে, কেশো-বুড়োর উপায়হীনতা ও বিপন্নতা এক ফুৎকারে পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে উড়ে যায় বলেই অবলীলায় স্ত্রীকে বলতে পারে 'মাগী চুপ কর, কুত্তী' এবং পুরুষ বলেই সে আত্মজার উপর বিস্তার করতে পারে পুরুষতান্ত্রিক দাপটতা। সামাজিক অবক্ষয় এবং দেশবিভাগজনিত মানবিক বিপন্নতার পাশাপাশি আলোচ্য গল্পে সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকতর অবমাননা ও লাঞ্ছনার দেশচিত্রটিও উন্মোচিত হয়েছে। পাঠকের ভাবনাকে অধিকৃত করে রাখে সমাজবাস্তবতার এক নির্মম অনুষঙ্গ নারী-নিগ্রহের চিরাচরিত ভাবসত্য। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> কেশো-বুড়ো নিম্নবর্গের মানুষ– আত্মজাকে গ্রামীণ যুবকদের কাছে বিক্রি করে তাকে নির্বাহ করতে হয় সংসার। সুহাস-ফেকু-ইনাম– এরাও নিম্নবর্গ। সুহাসকে নারী-ভোগের জন্য বড় ভাইয়ের পকেট মারতে হয়, ইনাম ভিড়ের মধ্যে মানুষের পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে, ফেকুকে দু'টাকা জোগাড় করতে গলদঘর্ম হতে হয়। টাকা নেই বলে ইনাম যেতে পারে না রুকুর ঘরে– এসবই বলে দেয় ওই চরিত্রগুলোর অবস্থান নিম্নবর্গে। লক্ষণীয়, এসব ক্ষমতাহীন পুরুষ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে নারীর কাছে। নিম্নবর্গের সমাজবাস্তবতায় নারী যে আরো নিম্নঅবস্থানে, তারা যে 'তলের তল' (bottom of the bottom), সে-কথা রুকু কিংবা তার মায়ের অবস্থা ও অবস্থান দেখে অনুধাবন করা যায়।(বিশ্বজিৎ, ২০১২ : ৭৩)

গল্পটিতে সামূহিক অবক্ষয়ের অন্তরালে নারীর প্রতি পুরুষের অধিকারবোধ ফলানো বা নারীকে অবলীলায় ভোগের সহজাত প্রবৃত্তি পাঠককে এই সত্যে উপনীত করে যে :

> পুরুষ-প্রধান সমাজ নারী নির্যাতনে যে খারাপ কিছু আছে তা মনে করে না। ... বয়স, স্থান, কাল নির্বিশেষে সকল নারী বস্তুত নির্যাতনের সম্ভাব্য লক্ষ্য। ... পুরুষ নির্যাতন করার অধিকারী এবং নির্যাতন সহ্য করা নারীর কর্তব্য, এই বোধ জাগ্রত করে নারীকে প্রতিবাদ বা প্রতি আক্রমণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও সংস্কার নারীর মধ্যে হীনমন্যতা সঞ্চার করেছে, সে নির্যাতনকে আত্মস্থ (internalise) করে নিয়েছে।(মাহমুদা, ২০০২ : ৩০)

ফলে গল্পটি কেবল সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময় ও পরিপার্শ্বের নিদারুণ অবক্ষয়ের বস্তুনিষ্ঠ দেশচিত্রটিকেই উন্মোচন করে না বরং একই সঙ্গে সমাজের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার নির্মম-মাত্রাটিকেও প্রতিবিম্বিত করে তোলে।

এই পর্বের গল্প 'পরবাসী' বা 'মারী'তেও উঠে এসেছে দাঙ্গার উন্মত্ততা বা উদ্বাস্তু জীবনের নির্মম ছবি। 'পরবাসী' ও 'মারী' গল্পের মধ্যে উন্মোচিত দাঙ্গা-কবলিত মানুষের মর্মন্তুদ জীবনালেখ্যর মধ্যে বিপর্যস্ত নারী-জীবনের করুণ ইতিবৃত্তটি খুব স্বল্প পরিসরে বিবৃত হলেও এরই মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতার এক বীভৎস নারকীয় অসহ সময়ের চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। দাঙ্গার ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও বিপণ্নতার বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে টুকরো টুকরো কয়েকটি দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের দাঙ্গা-পরবর্তী নাজুক অবস্থার স্বরূপটি অনুধাবন করা যেতে পারে এভাবে :

> ক. দল ছেড়ে প্রাণপণে ছুটল বশির। বাড়িটা ততক্ষণে পুড়ে শেষ। ওরা চলে গেছে। বল্লম দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা বশিরের সাত বছরের ছেলেটা। ছাব্বিশ বছরের একটি নারীদেহ কালো একখণ্ড পোড়া কাঠের মত পড়ে আছে ভাঙা দগ্ধ ঘরে। কাঁচা-মাংসপোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস ভারী। ('পরবাসী', *আত্মজা ও একটি করবী গাছ, রচনাসংগ্রহ-১* : ১৪৫-১৪৬)

> খ. হলঘরভর্তি মানুষ– বুড়ো যুবক মাঝবয়সী শিশু তরুণী যুবতী আর অকথ্য গোলমাল। কাঁথা, দুচারটে শুকনো কাঠ, এক আধটা শানকি– একটি সংসার। হলঘরে কুড়িটি পরিবার– নফর গুনে এলো– রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, গল্প, রোগের সেবা, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো সব চলছে। ... হুড়মুড় দৌড় লাগিয়ে তিরিশ বছরের তরুণী প্রায় ওপরে পরে পাশের ঘর থেকে এসে, কই কে দুধ দিচ্ছে? আমার বাচ্চাটার জন্যি– মতলেব ধমক লাগায়, দুধ লাফাচ্ছে! ('মারী', *আত্মজা ও একটি করবী গাছ, রচনাসংগ্রহ-১* : ১৬৫-১৬৬)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে দাঙ্গা-পরবর্তী অস্থির ও অনিশ্চিত জীবনে বিপর্যস্ত মানবতার মধ্যে নারীর অবস্থা যে আরো বেশি মাত্রায় করুণ ও বিপন্ন হয়ে পড়ে– সে-বিষয়টিই শিল্পিত হয়েছে। বশিরের ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবতী স্ত্রীর কয়লার মতো দগ্ধ শরীর কিংবা অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যেও সমস্ত সংকোচ ও লজ্জা ভুলে যেতে বাধ্য হয়ে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো নারীর বিব্রত ও অসহনীয় অবয়বে কিংবা দুধের জন্য পাগলপ্রায় মাতৃহৃদয়ের হাহাকার প্রকারান্তরে গল্পদুটির মধ্য দিয়ে যে কোনো যুদ্ধ বা দাঙ্গাকবলিত পরিস্থিতিতে নারীর অধিকতর শোচনীয় বাস্তবতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'সারা দুপুর', 'অন্তর্গত নিষাদ' ও 'উটপাখি' গল্পগুলোর পটভূমি সমাজ জীবনের ব্যাপক অবক্ষয়, সংসারের নিরবচ্ছিন্ন গতিধারা থেকে ছিটকে-পড়া মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও এর অন্তরালে সমকালের সর্বনাশের অসহ, বীতশ্রদ্ধ জীবন-পরিপার্শ্বের নির্মম বাস্তবতা। আলোচ্য গল্পগুলোর কতিপয় উদ্ধৃতি

অবক্ষয়পীড়িত, অসহ সময়-বাস্তবতায় নারী-জীবনের অধস্তন অবস্থা ও সমাজে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্কের স্বরূপটিকে অনুধাবনের নিরিখে স্মরণযোগ্য :

> ক. অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁকনের ইচ্ছে হয় মরে যেতে। মাগি খুব খারাপ কথা, ছি ছি করার মতো কথা? নাকি খারাপ জিনিশ? আব্বা একটা মাগির সঙ্গে চলে গেছে? ... কাঁকন নিজেদের ঘরে এলো, ঘরের ছায়ায় বিছানায় ফরশা একটা মানুষ শুয়ে, মায়ের কোলে তার মাথা, মা ওর চুলের ভেতর আঙুল চালাচ্ছে, তারপর মা তার মাথা নামিয়ে আনে। মা বিষণ্ন চোখে কাঁকনকে দেখল, বলল কাঁকন কাউকে কিছু বলবে না। ('সারা দুপুর', *আত্মজা ও একটি করবী গাছ, রচনাসংগ্রহ-১* : ১৫৩-১৫৪)

> খ. বিকট চিৎকার চালায় সে, কোথায়? চা দাও শিগগির। মহিলা বেরিয়ে এলেন। নির্বোধ মুখে বিস্ময় সেঁটে আছে। ... লোকটা আবার নির্বিকার মুড়ি চিবোয়। অকস্মাৎ স্ত্রী রণচণ্ডী সেজে বালক-বালিকাদের অবিরত পিটোচ্ছেন। ('অন্তর্গত নিষাদ', *আত্মজা ও একটি করবী গাছ, রচনাসংগ্রহ-১* : ১৫৯-১৬০)

> গ. আমি আর কাউকে খুঁজে পেলাম না, কবিতা, দর্শন কোন কিছু আমাকে কিছু দিতে পারল না। ... মনে হলো তুমি আমাকে কিছু দিলেও দিতে পারো। ... তাঁর চোখের তীব্র আলোর সামনে ভয় পেয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপতে থাকে মেয়েটি। ... এসব কি বলছ তুমি? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। আমরা কেউ চাইনা তুমি এখানে আসবে। ও ঘরে সে বসে আছে। এখুনি হয়তো আসবে এখানে। কি ভাববে তোমাকে দেখলে? ... লেখক হাসতে হাসতে বলেন, সংসার পাতছ, না? মেয়েরা আর কি করতে পারে? ('উটপাখি', *আত্মজা ও একটি করবী গাছ, রচনাসংগ্রহ-১* : ১৭৮-১৭৯)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে আমরা নারীর নানামাত্রিক জীবন-জটিলতাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। 'সারা দুপুর' গল্পে লক্ষণীয় কাঁকনের বাবা একটা 'মাগি' নিয়ে ভেগে যেতে পারে, সমাজের সকলেই সেটা জানে এবং অনেকটা স্বাভাবিক আচরণ-প্রবণতা হিসেবেই বিষয়টিকে অভ্যস্ত দৃষ্টিতে বিবেচনা করে। কিন্তু কাঁকনের মায়ের ক্ষেত্রে একই অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একধরনের দ্বিধা বা সংকোচ কাঁকনের মায়ের বিষয়টি গোপন রাখতে কাঁকনকে অনুরোধের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অচরিতার্থ যৌন-কামনার জৈবিক তাড়নায় নারী-পুরুষ উভয়েই তাড়িত হলেও এক্ষেত্রে সমাজ নারীর জন্য গোপনীয়তার অনুশাসনটি জোরালোভাবেই বলবৎ রেখেছে। এ বিষয়ে নারীর যে দ্বিধা-সঙ্কট তা পুরুষতন্ত্র-প্রসূত সমাজবাস্তবতায় নারীর অসম সামাজিক অবস্থানটিকেই মূর্ত করে তোলে। 'অন্তর্গত নিষাদ' গল্পে নিজের ভেতরে গুটিয়ে থাকা 'লোকটি/মানুষটি' যেন প্রবল পৌরুষ শক্তি অনুভব করে ঘরে ফিরে স্ত্রীর প্রতি কর্তৃত্বসুলভ আচরণের মধ্য দিয়ে। বাইরে যে পুরুষ হীনম্মন্যতায় ভোগে, তাকেও দেখা যায় ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে স্ত্রীর উপর হম্বি-তম্বি করতে বা উঁচুগলায় স্ত্রীকে অবদমিত করে রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠতে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় এ অতি পরিচিত

দৃশ্যপট যা প্রকারান্তরে সমাজে-পরিবারে নারীর প্রতি উপেক্ষার ভাষাটিকেই প্রতিবিম্বিত করে তোলে। 'উটপাখি' গল্পেও নারীর উপায়হীনতা ও সমাজ-প্রসূত প্রথাগত ভাবনায় নারীর চিত্ত-সঙ্কটের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষণীয়। একসময়ের প্রেমিক লেখক মেয়েটির বাসায় এলে দারুণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিব্রত বোধ করে মেয়েটি। ঘরে স্বামীর উপস্থিতি মেয়েটিকে রীতিমতো সংকোচে ফেলে দেয়। 'মেয়েরা আর কি করতে পারে?' এ বাক্যের মধ্য দিয়ে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপায়ণের ক্ষেত্রেও নারীকে যে সমাজ-পরিবারের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়, যদিও ক্ষেত্রটি পুরুষের জন্য ঠিক একইরকম সঙ্কুচিত নয়, সংসারের দায়িত্ববোধের যূপকাষ্ঠে জলাঞ্জলি দিতে হয় একান্ত ব্যক্তিক চাহিদা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে— গল্পটিতে মেয়েটির বিব্রত বোধের প্রসঙ্গটি পাঠককে সমাজবাস্তবতায় নারীর অধস্তন ও অসম অবস্থানের স্বরূপটিকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

জীবন ঘষে আগুন

হাসান আজিজুল হকের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *জীবন ঘষে আগুন*। এ গ্রন্থে আছে মোট তিনটি গল্প– 'শোণিত সেতু', 'খাঁচা' ও 'জীবন ঘষে আগুন'। 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পগ্রন্থের মধ্যে লক্ষণীয় যে : "অনেকান্ত প্রেক্ষাপট, বিচিত্র মানুষ এবং তাঁদের জটিল মিশ্র জীবন হাসানের গল্পের প্রতিপাদ্য।" (চঞ্চলকুমার, ২০১২ : ৮৯) আলোচ্য গল্পগ্রন্থে রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণে লেখক যেমন প্রবেশ করেছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনমূলে তেমনি এরই সমান্তরালে সময়, সমাজ ও মানব-অস্তিত্বের বিচিত্র টানাপোড়েনে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে নারী-জীবনের নানামাত্রিক জীবন-অভিধা।

'শোণিত সেতু' গল্পটির সমগ্র বলয়ে জীবনের সুনিপুণ আলেখ্য তিনটি সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একদিকে মানিক ও অবলাকান্ত নামক দুটি ষাঁড় পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ। অন্যদিকে দরিদ্র নিশানাথ দিনরাত লড়াই করে চলেছে ক্ষয় রোগ তথা আসন্ন মৃত্যুর বিরুদ্ধে এবং এরই পাশাপাশি শহর থেকে আগত চতুর ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে গ্রামের নিঃস্ব দরিদ্র নিম্নবিত্ত চাষিশ্রেণি লিপ্ত হয়েছে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে। লক্ষণীয় যে : " 'শোণিত সেতু' গল্পে ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনা ত্রিভুজের তিনবাহুর মতো বিস্তৃত হলেও অভিন্ন চেতনায় ও তাৎপর্যে তারা একাত্ম। কাহিনিবৃত্তের অন্তঃগর্ভে প্রতীকের এই সমান্তরাল বহমানতা এ গল্পের বিন্যাস-কৌশলে এনেছে অভিনবত্ব।" (চঞ্চলকুমার, ২০১২ : ৯৬) তিনটি পৃথক ভিন্নধর্মী ঘটনার অবতারণা করা হলেও আন্তরসূত্রে তারা সমচেতনাসম্পন্ন এবং নিগূঢ় ঐক্যে কেন্দ্রীভূত। এক অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ ও প্রতিস্পর্ধায় রোধ করার প্রচেষ্টা গল্পটিতে শিল্পিত হয়েছে। গল্পটির মধ্যে সামূহিক অবক্ষয় ও মানবতার দুর্মর প্রতিজ্ঞা ও অজেয় প্রাণশক্তির ব্যাপক পরিচয়ের সমান্তরালে বিধৃত নারী-জীবনের এক বিশেষ দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি নিবন্ধিত হয়। নিশানাথের অসুস্থতা ও মৃত্যু আশঙ্কার চিত্রটি গল্পে যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে

তাতে একই সঙ্গে সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতাটুকুও আভাসিত হয়েছে এভাবে :

> একই মায়ের পেটের একটি চমৎকার ভাই ছিল নিশানাথের। সামান্য একটু দোষ ছিল তার। বউকে বড্ডো পিটোত। আর কাঁচা পয়সা যা পেত মদ গাঁজা ভাঙ খেয়ে ফুঁকে দিত। ভাইটিকে বড্ডো ভালোবাসত সে। অদ্ভুত ব্যাপার এই, এজন্যে মার খেত নিশানাথের বউ। নিশানাথ ভাইকে ভালোবাসবে আর মার খাবে নিশানাথেরই বউ– কারণ ভাইটা সব উড়িয়ে দিচ্ছে অথচ তার বিরাট সংসারটিকে টানতে হচ্ছে নিশানাথকেই একথাটা বলায় দোষের কি আছে বোকা বউটা কোন দিন বুঝতে পারল না।' ('শোণিত সেতু', *জীবন ঘষে আগুন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ২১১)

লক্ষণীয় যে, নিশানাথের ভাইয়ের বউ এবং নিশানাথের বউ— উভয় নারীই স্বামী কর্তৃক নিদারুণভাবে নিগ্রহের শিকার। এমনকি গল্পের মধ্যেও বিষয়টি সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে একেবারেই নিতান্ত মামুলি একটি বিষয় হিসেবেই যেন উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক মূলত সমাজসত্যকে বিধৃত করেছেন। ফলে আর দশটা প্রাত্যহিক প্রবণতার মতোই যেমন, ভাত খাওয়া, গোসল করা, ঘুমানো, কিংবা দৈনন্দিন যে কোনো আচরণের মতো নারীকে তথা স্ত্রীকে প্রহার করাও যে নৈমিত্তিক একটি কাজ, পুরুষ এহেন আচরণের মধ্য দিয়েই নিজের অক্ষমতা আড়াল করে রাখে এবং ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য পৌরুষ-শক্তিতে তৃপ্ত বোধ করে। এ কথা তো অনস্বীকার্য যে :

> পুরুষ প্রধান সমাজ নারীনির্যাতনে যে খারাপ কিছু আছে তা মনে করে না। স্ত্রীকে প্রহার মানবতা-বিরোধী, এমন অপরাধবোধ স্বামীর কদাচিৎ থাকে। ... সবল স্ত্রী রুগ্ন অক্ষম স্বামীর হাতে মার খেয়েও প্রতিঘাত করে না, কারণ সে মনে করে স্বামীর কাছ থেকে প্রহার তার প্রাপ্য। স্বামীর গঞ্জনার জবাব দেওয়া স্ত্রী বেয়াদব মনে করে। ... কে নারীকে নির্যাতন করে? জনাব পরিষ্কার— পুরুষ; বয়স, ধর্ম, বর্ণ, নরগোষ্ঠী নির্বিশেষে পুরুষ। (মাহমুদা, ২০০২ : ৩০)

গল্পটিতে খুব সামান্য পরিসরে হলেও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে চিরন্তন নারী-নিগ্রহের বাস্তব স্বরূপটিকে জীবনঘনিষ্ঠভাবে শিল্পিত করা হয়েছে।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদের কারণে ১৯৪৭ সালে যে দেশভাগ, উপমহাদেশ ভেঙে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারত-পাকিস্তানের যে রাজনৈতিক পালাবদল, তার যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ-পরিবার আর পরিবেশের সরাসরি ধারাভাষ্য হাসান আজিজুল হকের 'খাঁচা' গল্পটির ক্যানভাস। অম্বুজাক্ষ-সরোজিনীর পরিবার ভারতে যাবে বাড়ি-সম্পত্তি বিনিময় করে— প্রস্তুতি চলছে; এর মধ্যে ঢুকে পড়ে কিছু পারিবারিক সঙ্কট আর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা। এভাবেই গল্পের গঠন ও অগ্রগমন। দেশভাগ ও দেশত্যাগের প্রাক্কালে বিমূঢ় ও অসহায়-স্বপ্নহীন মানুষের বিপন্নতা ও অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটকে আলোচ্য গল্পে সরোজিনীর বিক্ষুব্ধ চিত্তের সংবেদনে রূপায়িত করা হয়েছে এভাবে :

> এই সময়ে বিকট আওয়াজ করে সেতারের খোলটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেলে অম্বুজাক্ষ চোখ মেলে সরোজিনীকে দেখতে পায়। সে তখন হাতের ছোট লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হারিকেনটা তুলে নিয়েছে। সেটা চুরমার হয়ে গেলে সরোজিনী অম্বুজাক্ষের দিকে এগিয়ে আসে। অম্বুজাক্ষ বার বার চেঁচায়, মিনতি করে, সরোজিনী, আমাকে নয়, আমি নই। ('খাঁচা', *জীবন ঘষে আগুন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ২৪৭)

নির্বিবাদী এক-একটি পরিবারের ধাপে ধাপে ভাঙন, এটাই যেন এ সময়ের বাস্তব ছবি। আর এই অধঃপতিত সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়েও নবোদিত সূর্যের আশায় মানুষ কঠোর, আপসহীন সংগ্রাম করে যায়, স্বপ্ন দেখে যায়। সরোজিনী চরিত্রের অবয়বে সেই স্বপ্নের প্রতিচ্ছবিটি প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে আলোচ্য গল্পে; একই সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় জর্জরিত মানবাত্মার রক্তাক্ত ও বিদীর্ণ চিত্তের স্বরূপটিও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে সরোজিনীর ক্ষুব্ধ প্রতিমূর্তির আদলে। আলোচ্য গল্পের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে : "দেশবিভাগ প্রসূত সামাজিক আবহকে ছোটগল্প নামক শিল্পরূপে যেভাবে হাসান আজিজুল হক বেঁধে রাখলেন তাতে তিনি সত্যি সত্যিই সময়ের প্রহরী, এবং আমাদের সমাজমানসে এক জাগ্রত বিবেকের নাম।" (বিকাশ, ২০১২ : ১৫৩)

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'জীবন ঘষে আগুন' একটি বিরাট আকারের ছোটগল্প। গল্পটির পটভূমি পশ্চিম বাংলার খরা-কবলিত ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রাঢ় অঞ্চলের গ্রামসংলগ্ন একটি মেলা। গল্পটির কাঠামো ও পরিপ্রেক্ষিত আঞ্চলিক হলেও এর মৌল প্রতিপাদ্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর পতন। হলকর্ষণের মহোৎসবকে কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ নরনারী বাৎসরিক মেলায় সমবেত হয়। রাঢ়বাসীর দৈবনির্ভর জীবন, দারিদ্র্য, মহাজনি শোষণ, মেলার বিচিত্র চালচিত্র, চাকলা মহাপুণ্যভূমিতে নরবলিদান, বাবুশ্রেণির প্রতি বাগদি জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রভৃতির রূপায়ণে গল্পটি অনবদ্য শৈল্পিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে। বস্তুত এ গল্পের কাহিনি ঔপন্যাসিক আয়তনে বিস্তার লাভ করলেও এতে কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র এমনকি এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। গল্পের প্রতিটি প্রান্তিক চরিত্র নিজস্ব ভঙ্গিতে উজ্জ্বল এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র খণ্ড প্রান্তিক চরিত্র নিয়েই গড়ে উঠেছে কাহিনিবৃত্ত। গল্পটির অন্তর্মূলীয় ভাবসত্যের অবয়বে উন্মোচিত হয়েছে রাঢ় বঙ্গের ভূমিহীন তেতুঁলে বাগদিদের যন্ত্রণাকাতর জীবনের বঞ্চনা ও অসহায়ত্বের ইতিবৃত্ত। গল্পটিতে বিধৃত কতিপয় উদাহরণে সমাজে বিদ্যমান নারীর অসম অবস্থান ও নারীর প্রতি নির্যাতনের মর্মন্তুদ আলেখ্যটি প্রতিভাত হয়েছে এভাবে :

> ক. ছোটনোকের হাতে জল খেঁলে জাত যাবে যি গঁ তুমার। বুলছো কি- আঁ? তাইলে ছোটজাত মানুষ বটে বুলছো- আরি বাবারে বাবা। ছোটজাতের জলে দোষ নাই বটে, বাহারি বাহা! ছোটজাতের আর কিসে দোষ থাকতে নাই বল দিকিনি

বাবু? ... ছোটজেতের সবেতেই দোষ। তবে একটোতে বোধহয় দোষ নাই– কি বলো বাবু? ছোটজেতের মিয়েতে দোষ নাই। ঠিক কতা লয়, বাবু। মিয়েগুলো খায় না দায় না, তেবু তাদের গতর হয় ধাড়ি শুয়োরের মতো, লয়? ভারি মজার কতা বটে! মেয়েমানুষটির হাসি এতক্ষণে ফাটলো। ... দুটো ট্যাকা দিতে হবে মোকে। তার কমে হবে না। একটি ক্ষতির ক্ষোভ যুবকটির বুকে আঘাত করে, তার হৃৎপিণ্ড ধ্বকধ্বকায়, কারণ পিঙ্গলার বরাদ্দ আধুলিটি তার ট্যাঁকে আলাদা করাই ছিল! ... যুবকটি হেসে উঠে বলে, তাই নিবি যা। এখন চল, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ('জীবন ঘষে আগুন', *জীবন ঘষে আগুন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ২৬৯-২৭০)

খ. মেয়েটি অবশ্য খুবই ক্ষিপ্র, সে চোখের নিমেষে একটি ছেঁড়া চটের পর্দা টেনে দেয়। ... চটের ওপাশেই চপাৎ চপাৎ ভক্ষণের আওয়াজ– গলনালি অতিক্রমকারী খাদ্যস্রোত ফুঁড়ে ব্যক্তিটি আঁকুপাঁকু অস্ফুট শব্দগুলি বাইরে চালান করে, লরক, লরক। লরকে যাবি তু– কুনো বাপ আটকাইতে পারবে না তুকে– তু মাগী সোয়ামীর ছামনে লাং নিয়ে এলি গঁ– ই কি সব্বোনাশ। ভগবান শালা, তু কি দেখিস গঁ– আঁ? তু শালাও কি আমার মতুন চিৎপটাং শুয়ে মেগের ভাত গিলচিস? এই সব অভিশাপের পর আবার চপাৎ চপাৎ ভক্ষণের আওয়াজ ওঠে। ('জীবন ঘষে আগুন', *জীবন ঘষে আগুন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ২৭১-২৭২) ,

গ. এমনি মনে হয়েছিল যে মেয়েটি ক্রমান্বয়ে ডুবছে আর ভাসছে। ... দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে তুর মা দেখচিস লিকিন্ মা মেগো বজ্জাৎ– এই বলে কালী সম্পূর্ণত নিরাবরণ হয়েছিল। অচিরেই সে ঘরের বদ্ধ বায়ুতে সঘন নিশ্বাস বাজে, কোনো বিকট ছায়া মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয়– বিপরীতে দুটি হাত এমনি মুষ্টিবদ্ধ যে কণ্ঠের অজস্র শিরায় নির্মম টান পড়ে– দুই দন্তপঙ্ক্তি পরস্পরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়– একটি মাংসের শরীর শুকনো কাষ্ঠে পরিণত হয়। ('জীবন ঘষে আগুন', *জীবন ঘষে আগুন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ২৭২)

ঘ. এসবেতেই চরম বিশৃঙ্খলা– সেজন্যে কাউকে বলতে হয়, সবই আক্রা গঁ– শুধু মেয়েমানুষ শস্তা, লয়? ... উরি বাবারি বাবা, কি ভংকর বেপার বটে। মাঘের ধানে খরা পেরোয় না, ই বাদে আবার বাবু মশাইদের মিয়েমানুষ চাই– । ... আহা রি, ই পোড়া দ্যাশে কাজ নাই, এখানে অন্ন নাই, ভদ্দরনোকে ভাত ছিটিয়ে মেয়েমানুষ ন্যাংটো করবে গঁ– আঃ হায় হায় রি! ('জীবন ঘষে আগুন', *জীবন ঘষে আগুন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ২৭৪-২৭৭)

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলিতে নারী-জীবনের অবর্ণনীয় নিগ্রহ এবং বঞ্চনা-অসহায় ও বিরূপ সামাজিক অবক্ষয়পীড়িত সমাজবাস্তবতায় নারী যে আরও বেশিমাত্রায় অবহেলিত ও পদদলিত — সেই দেশচিত্রটি বস্তুনিষ্ঠতার আলোকে শিল্পিত হয়েছে। আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখার যে প্রবণতা এর অন্তরালে নারীর মানবিক সত্তা ও আবেদন খারিজ হয়ে যায়। যে কোনো শ্রেণিতে, যে কোনো সমাজে

নারীকে তাই ব্যবহৃত হতে দেখা যায় পুরুষের ভোগলিপ্সা ও স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে। ঘণ্টাবাবু কালীকে ভোগ করার লালসায় অর্থ খরচ করে, অন্যদিকে কালীর দেহ বিক্রিত অর্থের বিনিময়ে আহার জোটে তার অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর। ঘণ্টাবাবু এবং কালীর স্বামী — এই উভয় পুরুষের কাছেই কালী স্বীয় স্বার্থপূরণের মাধ্যম হয়ে ওঠে, উভয় ক্ষেত্রে কালীর নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপমৃত্যু ঘটে। এভাবেই সমাজ নারীকে উপায়হীন, সহায়হীন করে তোলে যেখানে : "তার আর্থ-সামাজিক জীবন সীমাবদ্ধ বা শূন্য হয়ে পড়ে, পরিসর যায় সংকুচিত হয়ে। পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। নারীর জীবন পুরুষের তুলনায় তাই অধস্তন।" (মাসুদুজ্জামান, ২০১২ : ৪২৮) কেবল কালী নয়, সমাজে অগণিত নারীকে উপায়হীন হয়ে কালীর মতোই অপাঙ্‌ক্তেয় জীবনের গ্লানিকে আত্মস্থ করে নিতে হয়। এ গ্লানি থেকে নারীর কোনো নিষ্কৃতি নেই, কেননা : "নারীর দেহসৌষ্ঠব তার নিজস্ব, কিন্তু পুরুষ তা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের ভোগের বস্তুতে রূপান্তরিত করেছে। ... যৌন মিলনে নারীর ভূমিকা গৌণ; নিজের সন্তুষ্টি নয়, পুরুষের সন্তুষ্টি বিধান নারীর যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য। পুরুষ নারীকে উপভোগ করবে, তার স্বার্থে ব্যবহার করবে — এটাই নারীর নিয়তি।" (মাহমুদা, ২০০২ : ১২)

নামহীন গোত্রহীন

হাসান আজিজুল হকের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ *নামহীন গোত্রহীন*। এ গ্রন্থের পটভূমি লেখকের অন্যান্য গল্পগ্রন্থ থেকে অনেকটাই আলাদা। আলোচ্য গ্রন্থের বিচিত্র পরিসরে রূপায়িত হয়েছে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের নানাবিধ মর্মবিদারী ইতিহাস। প্রত্যেকটি গল্প হয়ে উঠেছে বাস্তবতার এক অনবদ্য সামাজিক দলিল। গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো যথাক্রমে 'ভূষণের একদিন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', 'আটক', 'ঘরগেরস্থি', 'কেউ আসে নি' এবং 'ফেরা'। আলোচ্য : "সাতটি গল্পের সমগ্রতায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও সমাপ্তিকে হাসান বাস্তবের আলোকে ধারণ করতে চেয়েছেন।" (জাফর, ১৯৯৬ : ৮৪) গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের ওপর নেমে আসা পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়াবহ পাশবিকতার চিত্র যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি এই পাশবিক অত্যাচারের খড়গ কীভাবে নারী-জীবনের তিক্ততম জঘন্য ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে সে ইতিবৃত্তও বিধৃত হয়েছে বাস্তবতার অনুষঙ্গে। কত বীভৎস ও বিকৃতভাবে যে বাঙালি নারীদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, কত অসংখ্য নারী যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেদের মান-সম্মান, ইজ্জত এবং সর্বোপরি জীবন হারিয়েছেন— তারই মর্মান্তিক আলেখ্য বিধৃত হয়েছে গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে। নির্যাতন কেবল পাক আর্মির সিপাহি ও অফিসাররাই করেনি, বাঙালি রাজাকার এবং অবাঙালি বিহারী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ নির্মম নির্যাতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলো। নির্যাতিত হয়েছে শহরের মেয়েরা যেমন, তেমনি গ্রামের মেয়েরাও। ধনী-গরিব, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকল শ্রেণির পরিবারের মেয়েরাই

নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আলোচ্য গল্পগুলোর কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> ক. একটানা শব্দ উঠলো কট্ কট্ কট্ কট্। তখন ভূষণ দেখলো গোড়া কেটে ফেললে গাছ যেমন তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ে, মানুষ তেমনি করে মাটিতে পড়ছে। ... আশি বছরের বুড়ি বুলেটে চুরমার হয়ে যাওয়া বুক অগ্রাহ্য করে কোমরে ছেঁড়া কাপড়ের কষিটা আঁটবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ... চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে তার কালো কুতকুতে বাচ্চা কোলে তেঁতুলগাছের দিকে এগিয়ে এলো। ঠাস করে একটি শব্দ হলো। মেয়েটি বাচ্চার মাথায় হাত রাখে। ভূষণ দেখে মেয়েটির হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত আসছে– শেষে রক্ত-মেশানো সাদা মগজ বাচ্চাটার ভাঙা মাথা থেকে এসে তার মায়ের হাত ভর্তি করে দিলো। মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো, বাচ্চার মুখের দিকে চাইলো, পাগলের মতো ঝাঁকি দিলো তাকে কব্যার– তারপর অমানুষিক তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাচ্চাটাকে; দুহাতে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেললো তার ময়লা ব্লাউজটাকে। তার দুধেভরা ফুলে-ওঠা স্তন দুটিকে দেখতে পেল ভূষণ। সে সেই বুক দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মার হারামির পুত, খানকির পুত– এইখানে মার। পরমুহূর্তেই পরিপক্ক শিমুল ফলের মতো একটি স্তন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ছিটকে এসে সে পড়ল তেঁতুলতলায়। আক্রোশপূর্ণ ভয়শূন্য চাউনি নিয়েই সে মরে রইল। ('ভূষণের একদিন', *নামহীন গোত্রহীন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ৩০১-৩০৩)

> খ. অতি দ্রুত একটি জিপ এসে ঘ্যাস করে ব্রেক কষে বড় রাস্তার উপরেই থেমে গেল। সে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্ত্রীলোকের গোঙানি শুনতে পেল। লোকটা তখন তার বুকের ভিতর খুব একটা কষ্ট অনুভব করল। ... ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠলে একজন বিজাতীয় মানুষের নিষ্ঠুর মুখ এবং একটি মুখবাঁধা স্ত্রীলোকের অবয়ব হঠাৎ দেখে ফেলল। সে এগিয়েই যাচ্ছিল– তক্ষুণি কেউ লাফ দিয়ে জিপে উঠল এবং তীব্র গতিতে সেটা চলে গেল।... সে লাল চওড়া বারান্দায় চুপি চুপি উঠে এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মোলায়েম গলায় ডাকল, মমতা আছো? মমতা? কেউ সাড়া দিল না। ... সে তার শিরাবহুল পেশল হাতে কোদাল তুলে নিল। দুবার তিনবার নাক আর মুখ থেকে হ্যাঁক হ্যাঁক করে আওয়াজ বের করে উঠোনে কোপ দিল সে। ... একে একে উঠে আসছে হাতের অস্থি, হাঁটুর লম্বা নলি, শুকনো সাদা খটখটে পায়ের পাতা। দরদর করে ঘাম ছুটছে তার সমস্ত দেহ থেকে। ... খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোট্ট হাত পেয়ে গেল, সেটাকে তুলে আপনমনেই লোকটা বলল, শোভন, শাবাশ। তারপর উঠে এলো দীর্ঘ চুলের রাশ, কোমল কণ্ঠাস্থি, ছোট ছোট পাঁজরের হাড়, প্রশস্ত নিতম্বের হাড়– তারপর একটি করোটি। খুলিটা হাতে নিয়ে সে ওটার চোখের শূন্য গহ্বরের দিকে চেয়ে রইল। ফাঁকা মুখগহ্বরের ভিতরে নিঃশব্দে বিকট হাসি হাসল করোটি। ('নামহীন গোত্রহীন', *নামহীন গোত্রহীন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ৩০৯-৩১৩)

> গ. এতক্ষণে নজরে পড়লো অশথ গাছটা ভর্তি হয়ে আছে শকুনে, কালচে ধূসর রঙের স্তূপে ঢাকা রয়েছে গাছটা। আশেপাশে নিশ্চয়ই মরা লাশ আছে। কদিন আগেই তো রাজাকারদের নিয়ে এখানে এসেছিলো পাক আর্মির একটা দল। হয়তো কোনো রেপ্‌ড্ মেয়েলোক পড়ে আছে ওখানে। ... পাঁচজন চেয়ে দেখে, যে গাছের নিচে তারা আশ্রয় নিয়েছিলো সেখানে অসংখ্য মানুষ এসে জমেছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধদের পরিষ্কার দেখতে পেল তারা। মেয়েরা বাচ্চা বুকে করে, বুড়োরা কাঁপতে কাঁপতে এসে পশুর মতো হুমড়ি খেয়ে জবুথবু হয়ে বসে পড়ছে। পরনের কাপড় পর্যন্ত ফেলে এসেছে কেউ কেউ, কিছু উলঙ্গ নারী আর বৃদ্ধ চোখে পড়লো। ('কৃষ্ণপক্ষের দিন', *নামহীন গোত্রহীন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ৩১৯-৩২২)

> ঘ. পুব-দক্ষিণ কোণের দিকে তিনজনে মিলে একটি মেয়েমানুষকে ন্যাংটো করছে। তার সরল উরু দুটি বেড়িয়ে পড়লো, তামাটে রঙের বিশাল তলপেট রোদ পড়ে চকমকিয়ে উঠলো কিন্তু জামিল শত চেষ্টা করেও তার চোখ দুটি দেখতে পেল না। কারণ দীর্ঘ কালো চুল তার মুখ ঢেকে ফেলেছে। একটি সৈন্য তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে খানার মধ্যে ফেলে দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শিকারের টুটি-কামড়ানো বাঘের মতো সৈন্যটির মাথা নড়তে লাগলো, পাগলাটে অমানুষিক হাসি ভেসে এলো, তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার সব শব্দ ছাপিয়ে তীরের মতো বাতাস কেটে চলে গেল। ('কৃষ্ণপক্ষের দিন', *নামহীন গোত্রহীন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ৩২৩)

> ঙ. উলঙ্গ মানুষ আকাশের দিকে আঁকশির মতো পা উঁচিয়ে আছে আর প্রায় সবাই চেয়ে রয়েছে। রাস্তার পাশে খানার অল্প জলকাদার মধ্যে উলঙ্গ মেয়েমানুষটির মুখ আর চোখ দেখতে পায় নি জামিল। মেয়েমানুষটি মরে পড়ে রয়েছে, তার যোনি বেয়নেট দিয়ে ছিন্নভিন্ন করা। যে দীর্ঘ কেশরাশি দিয়ে সে আবরণ তৈরি করতে চেয়েছিলো, তারই ফাঁকে ফাঁকে তার বিশাল নগ্ন নিতম্বদেশ জামিল দেখতে পায়–ফুটিফাটা লাল মাংসের ফাঁকে ফাঁকে শাদা চর্বিও তার চোখে পড়ে। ('কৃষ্ণপক্ষের দিন', *নামহীন গোত্রহীন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ৩২৫-৩২৬)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি-নারীর উপর নেমে আসা বর্বরোচিত নির্মম পাশবিকতার সত্যনিষ্ঠ চিত্রায়ণ। এ বাস্তবতা তো আমাদের অজানা নয় যেখানে "মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে হানাদার পাকসেনাদের দ্বারা প্রায় ১৪ লক্ষ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং স্বামী-পুত্র-কন্যা বা অভিভাবক হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন।" (মালেকা, ১৯৮৯ : ১৮৮) তাছাড়া গল্পগুলোর মধ্যে বিধৃত নারী-নির্যাতনের করুণ, বীভৎসতার চিত্রায়ণ পাঠককের চেতনাকে মুক্তিযুদ্ধের নির্মম ও পাশবিক ইতিহাসের মুখোমুখি করে তোলে যেখানে :

> অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত নিউজ ম্যাগাজিন 'পিক্স'-এর তথ্য অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা এদেশের তিন লক্ষ নারী ধর্ষিত হয়েছেন। জনৈক ব্রিটিশ চিকিৎসক ডাঃ ম্যালকম পটস জানান যে, বাংলাদেশের মাত্র তিনটি

> জেলাতেই ১২ হাজার ধর্ষিতা হতভাগিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। ২ নভেম্বর ১৯৭২ যুদ্ধ অপরাধ তদন্ত এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য থেকে এও জানা যায়, পাকিস্তানিদের নয় মাসব্যাপী ত্রাসের রাজত্বকালে বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক নারী নির্যাতিতা হয়েছেন। সে সময়ের মানবতাবাদী গবেষক ডঃ জিওফ্রে ডেভিস বলেছেন, বাংলাদেশে ধর্ষণের ফলে প্রায় দু'লক্ষ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মধ্যে এক লক্ষ ৭০ হাজার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্থানীয় গ্রাম্য ধাত্রী বা হাতুরে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটান এবং বাকী ত্রিশ হাজারের মধ্যে অধিকাংশই সে সময় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। (শাহনাজ, ২০০৭ : ১৬৩)

ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য বিবরণীতে নারী-নির্যাতনের যে চিত্র পাওয়া যায় অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালি নারীদেরকে কতভাবে কত উপায়ে কত বিকৃতভাবে নির্যাতন করা হয়েছে — তারই সচিত্র প্রতিবেদন আলোচ্য গল্পগুলো।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যকার অসঙ্গতি ও মানবতার নিদারুণ বিপন্নতার বাস্তব চিত্রায়ণ শিল্পিত হয়েছে 'ঘরগেরস্থি', 'কেউ আসে নি' এবং 'ফেরা' গল্পত্রয়ের বিচিত্র পরিসরে। গল্পগুলোর মূল প্রতিপাদ্যের সমান্তরালে নারী-জীবনের যে চিত্র প্রতিভাত হয়ে ওঠে তাতেও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনার তীব্রতম হাহাকার। একক কোনো নারী চরিত্র হিসেবে নয় বরং আলোচ্য গল্পত্রয়ের নারী-চরিত্রের অবয়বে বিধৃত হয়েছে অসহ সময় ও প্রতিবেশে রিক্ত-নিঃস্ব ও বিদীর্ণ মানবতার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনার মর্মন্তুদ জীবনালেখ্য। গল্পগুলোর কতিপয় উদাহরণ এই বিরূপ সময় ও অসহ প্রতিবেশকে উন্মোচনের জন্যে অনুধাবনযোগ্য :

> ক. ভানুমতী এইবারে ঝেঁজে উঠলো, কি সুখটা জেবনে পাইছো আমারে এট্টু কও তো? প্যাট ভরে খাতি পাইছো কোনদিন, পরের বাড়ি খেটে খেয়ে জেবন গেল। পোলাপানদের কোনোদিন দুটো ভালো জিনিস দিতি পারিছ– এট্টু ভালো জামাকাপড় দিতি পারিছ কও? ... বাংলাদেশের বউ ভানুমতী, কতোদিন ধরে সংসার করছে– কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার ! সে কি জানে না কেমন হতে হয় সুখের সংসার? গোয়াল, গাই-গরু, হাল-বলদ, জমি-জমা, পুকুরভর্তি মাছ আর গোলাভরা ধান দূরস্থিত স্বপ্নের মতো ভানুমতীকে প্রচণ্ড আকর্ষণে টানে। ('ঘরগেরস্থি', *নামহীন গোত্রহীন*, *রচনাসংগ্রহ-১*: ৩৪৯)

> খ. কিন্তু উঠে বসলো ভানুমতী, শানকি টেনে নিয়ে ভাত বাড়লো দুজনের জন্যে। ভাত বেড়ে সে চুপচাপ বসে থাকলো উদাসভাবে। ... কন্যাশোক ভুলে গিয়ে খুব মন দিয়ে ভাত খেয়ে যায় রামশরণ। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে শুকনো করে তুললো ভানুমতী কিন্তু ভাতের প্রথম গ্রাসটা মুখে তুলতেই চোখ আবার ভর্তি হয়ে গেল জলে। সুবিধে হবে না বুঝে আর মুছলো না ভানুমতী, ভাতে আলাদা করে আর নুন মাখানোর প্রয়োজন হলো না তার। ('ঘরগেরস্থি', *নামহীন গোত্রহীন*, *রচনাসংগ্রহ-১* : ৩৫২)

> গ. গফুর বিয়ে করেছিলো কিন্তু বউ নেই তার। যুদ্ধের আগের বছর বউ চলে গিয়েছিলো বাড়ি থেকে। তাকে খেতে দিতে পারে নি সে। বৌটা বেঁচে আছে কি না গফুর জানে না। সেই বউয়ের জন্যে গফুরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। আর তার বুড়ো মায়ের জন্যে, খেতে দিতে না পারলেও যে পালায় নি। ('কেউ আসে নি', *নামহীন গোত্রহীন, রচনাসংগ্রহ-১* : ৩৫৯)

> ঘ. চোখ বন্ধ করেও আলেফ ঘুমোতে পারে না, ঘুম ঘুম গলায় সে জিজ্ঞেস করে, লড়াই শেষ হয়ে গিছে জানিস? দ্যাশের কি হল ক দিনি? দ্যাশ স্বাধীন হইছে– বউ যেন মুখস্থ বললো। ... আমরা রাজা বাদশা হবো নাকি বল তো? বউ প্রতিবাদ করল, তা ক্যানো? রাজা বাদশা হবো ক্যানো? আমাদের দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না। মানে? ভাত-কাপড় পাবানি। ... মা বলে, তোরে সরকার থে ডাকবে না? আলেফ হাঁ হয়ে যায়, সরকার আমাকে ডাকপে? ক্যানো? তোরে ডাকপে না তো কারে ডাকপে? ... তোরে একা না ডাকুক, তোরা যারা নড়াইয়ে ছিলি তাদের ডাকপে না? আমি আমার এই ভিটের চেহেরা ফেরাবো আলেফ কয়ে দেলাম আর জমি নিবি এট্টু। এট্টা গাই গরু আর দুটো বলদ কিনবি– আর–। ... আলেফের বউ কথা বলল না। এখানে থাকলি খাতি পাবি ভাবিস? হয়তো খাতি পাবি না। না পাই। আবার পালাবি না তো? না। তোর যা পেটের জ্বালা! ঠিক কচ্ছিস খাতি না পেয়ে মরে গেলেও পালাবি না? আগের মতো জোরে জোরে মাথা নাড়লে ঝরঝর করে তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে। ('ফেরা', *নামহীন গোত্রহীন, রচনাসংগ্রহ-১* : ৩৭১-৩৭৪)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের মধ্য দিয়ে একটি সত্যই প্রতিধ্বনিত হয় যে, আলোচ্য গল্পগুলোতে বর্ণিত নারী-চরিত্রগুলো কোন একক বা বিচ্ছিন্ন সত্তা মাত্র নয় বরং তারা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের বৃহৎ গণমানুষের যোগ্য প্রতিনিধি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট, বিপর্যস্ত জীবন ও বিপন্ন মানবতার সকরুণ আর্তনাদ আলোচ্য গল্পগুলোতে নারী-জীবনের অবয়বে শিল্পিত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যকার অসঙ্গতি ও টানাপোড়েনের বিচিত্র দেশচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে গল্পে বর্ণিত নারী-জীবনের ধারাভাষ্যে।

পাতালে হাসপাতালে

হাসান আজিজুল হকের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ *পাতালে হাসপাতালে*। 'মধ্যরাতের কাব্যি', 'সরল হিংসা', 'সাক্ষাৎকার', 'পাতালে হাসপাতালে' এবং 'খনন' — এই পাঁচটি গল্প স্থান পেয়েছে *পাতালে হাসপাতালে* গল্পগ্রন্থে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজের অবক্ষয়, নৈরাজ্য ও হানাহানির তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে। 'মধ্যরাতের কাব্যি' ও 'সরল হিংসা' গল্প দুটোর প্রেক্ষাপট ও মাত্রার মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও প্রথম গল্পটিকে দ্বিতীয় গল্পেরই প্রস্তাবনা বা সূত্রপাত বলে মনে হয়। উভয় গল্পেই অত্যন্ত

চমৎকার কৌশলে ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতির বিনিময়ে বাংলাদেশের অর্জিত স্বাধীনতার অর্থহীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতার বিচিত্র প্রাহসনিক দিকটি গভীরতর তাৎপর্যে শিল্পিত হয়েছে। 'মধ্যরাতের কাব্যি' গল্পের বৃদ্ধা ও তার পনের বছরের নাতনি এবং 'সরল হিংসা' গল্পের জয়তুন, তসিরুন, টেঁপি, গোলাপি, পুষ্প — এরা সবাই গ্রামে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরেই উন্মূলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়। শহরের বিচিত্র জীবন ও পরিবেশে অসহায় উন্মূলিত এই নারীরা হয়ে পড়ে আরো বেশিমাত্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় ও আশারিক্ত। 'মধ্যরাতের কাব্যি' এবং 'সরল হিংসা' গল্পের পটভূমি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও বিপন্ন মানবতার করুণ আর্তি। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই সঙ্গতিহীন হয়ে পড়েছিলো, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো হাজার হাজার মানুষ। এ সময় সহায়-সঙ্গতিহীন মানুষ নৈতিকতা-অনৈতিকতার ভেদরেখা ভুলে বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রচেষ্টায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলো। নিম্নবিত্ত অসহায় রমণীরা বেঁচে থাকার সর্বশেষ উপায় হিসেবে পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয়। সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে গল্পকার স্থূলতমভাবে বাঁচার বিষয়টি 'সরল হিংসা' গল্পে উপস্থাপন করেছেন। গল্পদুটির কতিপয় উদাহরণ নারী-জীবনের নানামাত্রিক বঞ্চনা ও অসহায়ত্বের স্বরূপটিকে উন্মোচনের নিমিত্তে প্রণিধানযোগ্য :

ক. এইবার আমি মরতে যাই দাদি? ...

হায়, আমার কপাল– বলে বুড়ি উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। বুটের শব্দ শোনা যায়। মাথার কাছে। বুড়ি নড়ে না।

নাতনির ফেঁপে ওঠা পলকা শরীর। তার উপর হাত রাখতেই কণ্ঠার হাড়টি মুট করে ভেঙে যায়। সেইটিকে বেশ করে চুষে চুষে খাওয়া হলো। স্তনের মাংস এর মধ্যেই ছিবড়ে হয়ে গেছে। তার চেয়ে পাঁজরের হাড়গুলো নরম– কচকচ করে খাওয়া চলে কাছিমের হাড়ের মতো। অবশ্য একছিটে চর্বি নেই। ('মধ্যরাতের কাব্যি', *পাতালে হাসপাতালে*, *রচনাংগ্রহ*-২ : ১৭)

খ. সারাদিনে হামি একবার খেনু– দুধ হয়ে বেরিয়ে গেলু, তবে তো হামি আর বাঁচিম না– বসে বসে মেয়েটি আকাশ-পাতাল ভাবে। তিনটি ডাস্টবিন খোঁজা হয়ে গেছে তার, খানিক আগে নেমেছিলো এক ড্রেনে, কিছুই মেলে নি। ('সরল হিংসা', *পাতালে হাসপাতালে*, *রচনাসংগ্রহ*-২ : ১৮)

গ. বামনটি চট করে একবার টাকে হাত বুলিয়ে নেয়, তারপর বেঁটে বেঁটে গলে পড়া হাত ঢুকিয়ে এ-পকেট সে-পকেট হাতড়ে কি যে সে খুঁজে বেড়ায় সে-ই জানে। ...

শেষ পর্যন্ত বাঁ হাতে একমুঠো টাকা বের করে এনে সে মেয়েটির মুখের সামনে সামান্য নাড়াতে থাকে, অন্য হাতে প্রথমে মেয়েটির কাঁধ স্পর্শ করে। ফলে কি যে হয় তার এক ঝটকা মেরে মেয়েটির বুকের সামান্য কাপড়-টুকরোটা সে ফেলে দেয় মাটিতে। এরপর প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে তার ডান হাত মেয়েটির বুকে গিয়ে স্থির হয়। ... বামনের হাতের মধ্যে নোটগুলো দুমড়ে-মুচড়ে রয়েছে। মেয়েটি বলে, টাকা আগে দিমেন? ... তার হাতে টাকা দিয়ে সেই হাত আর ছাড়ে না লোকটা। সমস্ত নগর তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। এখন সে টিকিট কেটে গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে। ... মেয়েমানুষ সেইখানে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে চুল ছড়িয়ে ডাকিনীর মতো হাত বাড়িয়ে কয়েকবারই বলে, কই, কুনঠে তুই? ('সরল হিংসা', *পাতালে হাসপাতালে*, *রচনাসংগ্রহ*-২ : ২০-২১)

ঘ. সামনে, পিছনে, রাস্তার দিক থেকে, আলোর ভিতর দিয়ে অন্ধকার সরিয়ে মেয়েমানুষেরা এগিয়ে আসে– সাত আটটি মেয়েমানুষ। তারা এসে বামন মানুষটিকে ঘিরে ধরে। ... বামনটির দিকে তারা ঘুরে-ফিরে সেলাম ঠোকে, এই যে সায়েব, দ্যাখেন, মাত্তর এট্টা টাকা আমারে দিবেন। তালিই হইবে। এইভাবে জয়তুন, তসিরুন, টেঁপি, গোলাপি, পুষ্প ইত্যাদি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়। ... বামনকে ঘিরে উলঙ্গ মেয়েমানুষেরা দাঁড়িয়ে যায়। স্বচ্ছন্দ নির্বিকার ন্যাংটো মেয়েদের একটি দঙ্গল। এই যে সায়েব, আমরা সবাই দাঁড়াইছি আপনের ছামনে– আমাদের মধ্যে থিকা কারে নিবেন ন্যান– পসন্দ করেন একজনরে। ... সবাই মিলে চিৎ করে শুইয়ে দেয় লোকটাকে। বামন সব চেষ্টা ছেড়ে দেয়, দুহাত ছড়িয়ে দেয় দুদিকে, মেলে দেয় দুই পা যতোদূর যায়। জয়তুন দুই হাত একসঙ্গে করে তাকে ঠেঙিয়ে যায়। মেয়েরা যেখানে সুবিধে পায় সেখানেই লাথি বসায়, মাংসের মধ্যে নখ ডুবিয়ে দেয়। ... তসিরুন একা সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তার মুখের উপর দুই পা তুলে দাঁড়ায়। এইবার আপন বুকে দুহাতে দমাদম আঘাত করতে করতে সে নগরীর দিকে চেয়ে খলখল করে হেসে ওঠে। ('সরল হিংসা', *পাতালে হাসপাতালে*, *রচনাসংগ্রহ*-২ : ২১-২৫)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অবক্ষয়পীড়িত বিরূপ সময় ও প্রতিবেশের বাস্তবচিত্র যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি একই সঙ্গে এই রুগ্ণ বিবর্ণ সমাজে নারীর অবস্থা যে আরো বেশিমাত্রায় পদদলিত — সেই সমাজসত্যটিও শিল্পিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষকবলিত বাংলাদেশের অস্থির সময়-প্রতিবেশে শহরের রাজপথে, স্টেশনের প্লাটফর্মে, কলোনি বা বড়ো বড়ো অট্টালিকার আশে-পাশে, ফুটপাতে, পার্কে, বস্তিতে ভাতের অভাবে গ্রাম থেকে উন্মূলিত যুবতী মেয়েমানুষের ভিড় — টাকা ছিটালেই এক, দুই, তিন যতো ইচ্ছে পাওয়া যায়। 'সরল হিংসা' গল্পের জয়তুন, তসিরুন, টেঁপি, গোলাপি কিংবা পুষ্প — এরা সবাই যেন সেইসব অসহায় নারীরই প্রতিচ্ছবি। এ সকল পতিতা নারীরা : "গরল মেশানো সরল হিংসার পথ ধরে

টাকাওয়ালা শহুরে এক বাবুকে অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে খতম করে দিয়েছে। ... তসিরুন ও দলের অন্যান মেয়েদের জমাট বাঁধা দুঃখ-হতাশা ও বঞ্চনাকেন্দ্রিক যন্ত্রণাময় জীবনের বিস্ফোরণ ঘটেছে প্রতিবাদী হিংস্র ভঙ্গিতে।" (জাফর, ১৯৯৬ : ৯৮-৯৯) 'মধ্যরাতের কাব্যি' গল্পে বৃদ্ধার হতাশাখিন্ন মর্মের তলদেশ থেকে উচ্চারিত 'আহারে কপাল' শব্দদ্বয়ের মতো হতাশ্বাসে ভরা নিঃশ্বাস ফেলার পক্ষপাতী নয় 'সরল হিংসা' গল্পের তসিরুন ও দলের অন্যান্য মেয়েরা। নারী নিয়ে তামাশা করা টাকাওয়ালা মানুষের জন্য শহর-নগর যেন অভীষ্টিত সেই স্বর্গ সেখানে পয়সার বিনিময়ে নারীকে পণ্যের মতোই খুব সহজে বেচাকেনা যায়। নারীলিপ্সু সেইসব টাকাওয়ালা ক্ষমতাবান বিবেকবর্জিত মানুষদের বিরুদ্ধে 'মধ্যরাতের কাব্যি' গল্পের বৃদ্ধা ও তার নাতনি কিছুই করতে পারেনি — তারা না-পারলেও 'সরল হিংসা' গল্পের তাদেরই শ্রেণিভুক্ত জয়তুন, তসিরুন প্রভৃতি পতিতা নারীরা নিজেদের অবস্থান থেকে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। অনিবার্যভাবেই তাই দেখা যায় :

> উদরের জন্য তাদের যৌনতাকে, তাদের নারীত্বকে, তাদের মনুষ্যত্বকে বিক্রি করতে হচ্ছে বলে, সমস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের যে অসচেতন ক্রোধ, সেই ক্রোধের আক্রোশেই তারা বামন খরিদ্দারটিকে আক্রমণ করে। যে জান্তব বাঁচার স্তরে তাদের মনুষ্যত্ব নেমে এসেছে তাদের প্রতিরোধে তারা এক হিংস্র মুক্তির স্বাদ পেয়ে যায়।(সরিফা, ২০১২ : ১০১)

যদিও প্রতীকী প্রতিরোধ সম্পন্ন হলেও এ থেকে মুক্তির উপায় তাদের জানা নেই, তবুও বলা যেতে পারে নারীর যৌনতা অবলম্বিত হলেও ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতিরোধের ঘটনাটি গল্প-বিষয়কে মহত্ব ও বিশিষ্টতা দান করেছে।

আমরা অপেক্ষা করছি

হাসান আজিজুল হকের ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ *আমরা অপেক্ষা করছি*। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের মোট সাতটি গল্পের বিচিত্র পরিসরে : "মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতি শোষণহীন সমাজ গড়ার যে-প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল, সে-প্রত্যাশা কীভাবে এবং কতোভাবে হতাশার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে" (জাফর, ১৯৯৬ : ১০৯) — তারই চালচিত্র রূপায়িত হয়েছে অসাধারণ শৈল্পিক নিষ্ঠায়। হাসান আজিজুল হকের *নামহীন গোত্রহীন* এবং *পাতালে হাসপাতালে* গল্পগ্রন্থেও মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগের ব্যর্থতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, সে বিবেচনায় আলোচ্য গল্পগ্রন্থটি যদিও বক্তব্যের দিক থেকে সম্পূরক গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে মাত্রাগত দিক থেকে এ গ্রন্থের গল্পগুলো স্বতন্ত্র মেজাজের। আলোচ্য গল্পগ্রন্থে সংকলিত মোট সাতটি গল্প যথাক্রমে 'আমরা অপেক্ষা করছি', 'মিনি মাগনার চুমকুড়ি', 'হাওয়া নেই', 'মাটির তলার মাটি', 'সমুখে শান্তি পারাবার', 'পাবলিক সার্ভেন্ট' এবং 'অচিন পাখি'। 'আমরা অপেক্ষা করছি' গল্পটিতে সরাসরি রাজনৈতিক ঘটনার ও মতবাদকে মুখ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপন

করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এরই সমান্তরালে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব নারীর জীবনে কতটা বিপর্যয় ডেকে এনেছিলো তারও জীবনঘনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে এভাবে :

> রাজাকারবাহিনী তৈরি হচ্ছে। তারা শহরের গলিঘুঁচিতে, গাঁয়ের আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়েছে। যে কোনো মেয়ে তারা ভোগ করে। ... পাকিস্তানিরা তাদের তৈরি করেছে। আমাদের ভিতর থেকে। ... আমার মা এখনো ধর্ষিত হয় নি, আমার বোনও নয়। তোমার স্ত্রী বা বোনও নয়। কিন্তু তফাৎ কি? এই কোটি কোটি মানুষের দেশে যে কোনো মা বোন ধর্ষিত হতে পারে। হচ্ছে না হয়তো, কিন্তু হতে পারে। একটি দেশের জন্যে এর চেয়ে ভয়ানক পরিস্থিতি কল্পনা করা যায়? ('আমরা অপেক্ষা করছি', *আমরা অপেক্ষা করছি, রচনাসংগ্রহ*-২ : ৮৬-৮৭)

নারীর এ-ও এক মাত্রা। কেবল অস্ত্র হাতেই সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেই তাকে বীর মুক্তিযোদ্ধা বলা যায় না বরং যে ভয়াবহ নির্যাতন ও অমানবিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এ সময়কালে নারীকে চরম বীভৎসতার মুখোমুখি হতে হয়েছে — তার মূল্য বা গৌরব কোনো অংশেই একজন মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে কম নয়। এর মধ্য দিয়েই নারী অর্জন করেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের সম্মানজনক অংশগ্রহণের অধিকার। নারী এভাবেই হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য, অনিবার্য এক মহান সত্তা।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'সমুখে শান্তি পারাবার' গল্পে স্বাধীনতা উত্তরকালের খাল খননের জন্য খ্যাত সরকারি আমলে উপবাস জর্জরিত এক গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক পরিবারের একটু একটু করে সর্বস্ব হারানোর চিত্রপট এবং বৃদ্ধ ঐ কৃষকের চোখের সামনে তার যুবতী কন্যা ও পুত্রবধূকে সরকারি মাস্তানদের দ্বারা ধর্ষণের ভয়াবহ বীভৎসতা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে লেখকের নিরাবেগ নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অবক্ষয় পীড়িত প্রাহসনিক স্বরূপটিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। গল্পে দরিদ্র কৃষক পরিবারের ক্রমাগত অভুক্ত থাকার দুরবস্থার সময়ে শেষ সম্বল এক বিঘে জমি মাত্র পাঁচশো টাকার বিনিময়ে সরকারি পার্টির এক মাস্তান-মাতব্বর কীভাবে হস্তগত করেছে তার করুণ চিত্র যেমন আছে তেমনি যে লোকটি দুপুরের দিকে টাকা দিয়ে জমির দলিল নিয়ে গিয়েছিলো সেই লোকটিই তার দলবল নিয়ে এসে কেমন করে হামলা চালিয়ে টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে গেলো তারও নিদারুণ বর্ণনা লক্ষণীয়। কিন্তু সমস্ত কিছু ছাপিয়ে গল্পটিতে প্রকট হয়ে ওঠে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বর্বরতার এক বীভৎস আলেখ্য। টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যাবার প্রাক্কালে হঠাৎ দলের একজনের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে যায় ঐ ভাগ্য বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত ও আহত কৃষকের আঠারো বছরের যুবতী মেয়ের উপর। গল্পে নারকীয় সেই বীভৎসতার নির্মম চিত্রায়ণ ঘটেছে এভাবে :

> অতো, অতো ফর্সা নাকি মেয়ে? আঠার বছরের মেয়ে? তিনদিন খালি পেটে থেকেও অতো ফর্সা? ছেলেরা কোনো কথা না বলে দ্রুত কাজ করতে লাগলো। বাপের কাছে এসে দুজনে তার হাত পা কষে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিল। ছেলে ছিলো

> দেয়ালের কাছে। আর একজন এসে তার ঘাড়ে এমন একটা রদ্দা বসালো যে সে হাঁ-ক করে চিৎকার করে পা-হাত দুমড়ে মেঝেয় বসে পড়লো। ওরা দুজনের কারো চোখ বাঁধলো না।
>
> আমার মেয়ে সোনার তৈরি, ছেলের বউ আমার সোনার বউ। আমার চোখ দুটো তোরা বেঁধে দে- বেঁধে দে- শুয়োরের বাচ্চারা, চোখ দুটো বাঁধ- ঘরের মেঝে থেকে হিম ধাতব চিৎকার ওঠে- ভয়ানক লাথি এসে পড়ে ভিজে মাটিতে। মেয়ের গায়ে জামা ছিলো না। একটানেই চড়চড় করে শাড়ি ছিঁড়ে খসে পড়লো। ... তখুনি বোঝা গেলো চোখ বাঁধার আর কোনো দরকার নেই। চোখ খোলা থাকলেও কিছু দেখা যায় না। ... চোখের সামনে সব গলে যেতে শুরু করলো, শাদা ফেনা মাথায় দোলাতে দোলাতে প্রবল তোড়ে পানির ঢেউ এসে ঘর ভরে ফেললো। মেয়ে বউ যেন গঙ্গোত্রী। তাদের মুখ বেয়ে রুপোর পাতের মতো স্রোত নেমে আসছে। দুপাশের লাল মাটি গলে গলে পড়ছে- মেয়ে তুই কবে জন্মালি, মাগো তোরা কবে জন্মালি, জানোয়ারে ধরিছে তো বাপের কাছে লজ্জা কি- ও- ছেমরিরা- বাপের মাথা কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে। ('সমুখে শান্তি পারাবার', *আমরা অপেক্ষা করছি, রচনাসংগ্রহ*-২ : ১৩২-১৩৩)

নারীর প্রতি এই যে লোলুপতা ও ভয়াবহ পাশবিকতার নির্লজ্জ প্রকাশ আলোচ্য গল্পে বিধৃত হয়েছে তা কেবল গল্পের কাঠামোয় আবদ্ধ কোনো বিষয় হয়ে থাকে নি বরং প্রতিদিন সংঘটিত সামাজিক বাস্তবতার অনিবার্য প্রামাণিক তথ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। খবরের কাগজের পাতায় নারী ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের জন্য নিগ্রহ, এমন কি, হত্যা ইত্যাদি খবর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার প্রকারান্তরে শ্রেণি-শোষণ ও শ্রেণি-বৈষম্যকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। নারীর উপর পুরুষের পৈশাচিকতাকেও একই মানদণ্ডে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা :

> পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে পুরুষের চেয়ে হীন, নীচ, নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয়। পিতৃতন্ত্রের মূল কথা পুরুষের আধিপত্য ও নারীর অধীনতা। নির্যাতন চালিয়ে এবং নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে পুরুষ নারীকে পুরুষ-আধিপত্য মেনে নিতে এবং পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। নারীকে পুরুষের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রেখে নারীর উপর পুরুষের সর্বময় প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য পিতৃতন্ত্রের অস্ত্র নারী নির্যাতন। ধর্ষণ নির্যাতনেরই বিশেষ প্রকার মাত্র। (মাহমুদা, ২০০২ : ২৫-২৬)

স্বাভাবিকভাবেই তাই লক্ষণীয় যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে নারীর উপর যে নির্মম অত্যাচার ও পাশবিক বীভৎসতার পরিচয় ইতিহাসের এক অনিবার্য সত্য হিসেবে বিবেচিত, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে স্বাধীন একটি সার্বভৌম দেশেও নারীর প্রতি এহেন সহিংসতা ও বর্বরতার মাত্রাগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আলোচ্য গল্পেও তাই সামাজিক ধস আর অবক্ষয় ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের মানবিক বিপন্নতার

পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিকতার কাছে নারীর লাঞ্ছনা এবং অসহায়ত্বের নির্মম দেশচিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গে।

আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের ছত্রছায়ায় লালিত যুবশক্তি তথা মাস্তানবাহিনীর সদস্যের দ্বারা কেবল যে সমাজের ভাগ্যাহত সাধারণ শ্রেণির কৃষক কন্যা ও তার পুত্রবধূ ধর্ষিত হয় তাই নয় বরং কখনো কখনো সেই আঘাতটা বুমেরাং হয়ে কোনো বাঘা আমলার স্ত্রীর উপরও গিয়ে পড়তে পারে, বৈনাশিক এ আঘাত প্রকৃতির নিয়মেই যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, রাষ্ট্রপ্রধানের ডানহাত হয়েও তখন কিছুই করার থাকে না— এ রকম একটি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়েরই রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'পাবলিক সার্ভেন্ট' গল্পের পটভূমিতে। রাষ্ট্র প্রধানের ডানহাতের কাছের আসনটিকে যে আমলা তার বিশ বছরের প্রশাসনিক দক্ষতা ও নির্ভেজাল স্তুতি-স্তাবকতার মাধ্যমে দখল করতে সক্ষম হয়েছেন সেই বাঘা আমলা মামুন রশীদকে আলোচ্য গল্পের অবয়বে চিরে চিরে বিশ্লেষণের প্রয়াস যেমন লক্ষণীয় তেমনি রাষ্ট্র-লালিত মাস্তান বাহিনীর দর্প-দাপট ও দেশের আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেবার বা বলা যেতে পারে সরকারের মৌন সম্মতিতে আইনকে তাদের হাতে তুলে দেবার পরিণতিতে দেশ কীভাবে শাসিত হয়েছিলো, ভয়াবহ সেই পরিস্থিতিতে বাঘা আমলা মামুন রশীদের স্ত্রী শায়েলার তথাকথিত সেই যুবশক্তি বা পালিত মাস্তান কর্তৃক ধর্ষিত হবার ঘটনার আলোকে বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের কতিপয় উদাহরণ নারীর নানামাত্রিক জীবন-যন্ত্রণার স্বরূপটিকে অনুধাবনের জন্যে প্রণিধানযোগ্য :

> ক. এই সোফা তাদের বড়ো প্রিয়, এতে চড়ে তারা সাত ভুবন দেখে এসেছে। সময় সুযোগ যখন মিলেছে তখন এই সোফাতেই মামুন রকমারি খাবার খেয়েছে, মুখ ফিরিয়েছে নতুন স্বাদের মাংসে। সেইসব খাদ্যের নানা গন্ধ নানা চিহ্ন এখনো হঠাৎ হঠাৎ মামুন পেয়ে যায়। সেদিন সে পেয়ে গেল এক দীর্ঘ সোনালী চুল, ফোমের ভাঁজ থেকে যখন টেনে বের করছিলো, মনে হচ্ছিল যেন দৃঢ়লগ্ন দুই স্তনবলয়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসছে এক স্বর্ণতন্তু। ('পাবলিক সার্ভেন্ট', *আমরা অপেক্ষা করছি*, *রচনাসংগ্রহ*-২ : ১৩৫)

> খ. মেয়েরা কোনো গন্ধ পায় না। শুয়োপোকার মতো অন্ধ তারা। তাদের ঈর্ষা বড়ো ছোট জায়গায় ঘুরপাক খায়। তারা কেবল নিজেদের দেখে। আপন আপন পুরুষমানুষকে নাভিমূলের চারপাশে নাকে দড়ি বেঁধে ঘোরাতে চায়। মামুন সারাদিন বসে বসে আকাশের রং ফেরা দেখতে পারে। মেয়েরা তা পারে না। শুয়োপোকার দল! ('পাবলিক সার্ভেন্ট', *আমরা অপেক্ষা করছি*, *রচনাসংগ্রহ*-২ : ১৩৬)

> গ. বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে যে শায়েলাকে সে চিনেছে আজ যেন তাকে খুবই নতুন মনে হচ্ছে। একটি অশিষ্ট শব্দ সে তার মুখে কখনো শোনে নি, এতই সংগোপনে সে জীবনযাপন করেছে যে মামুন নিজের ভোগলালসাভরা দিনরাত্রি নিয়ে কখনো বিব্রত পর্যন্ত হয় নি শুধুমাত্র এই কারণে যে শায়েলা যখন হাঁটে তার পায়ের

শব্দ পাওয়া যায় না। ... সেই শায়েলা এখন কি কদর্য কুৎসিত কথাগুলোই না বলে চলেছে। ওর মোমের মতো শাদা মুখের উপর শঙ্কর মাছের লেজের তৈরি চাবুক দিয়ে একটি তীব্র আঘাত করার জন্যে মামুনের হাত নিশপিশ করে ওঠে। ('পাবলিক সার্ভেন্ট', *আমরা অপেক্ষা করছি, রচনাসংগ্রহ*-২ : ১৪৩)

ঘ. আমাদের কোনো সুন্দরীর প্রয়োজন নেই। আর সতীর প্রয়োজন তো নেই-ই। কিংবা সতী উচ্ছন্নে যাক– সতী অসতী আলাদা করার জন্যে কোথাও কোনো দাগ নেই– তা নিয়ে মামুন মাথা ঘামাচ্ছে না– তবে সতীপনা দেখানোর জন্যে একজন রাজপুরুষের বাড়ি উপযুক্ত জায়গা নয়। এই ব্যাপার নিয়ে দেবার মতো সময় সত্যিই তার নেই। ('পাবলিক সার্ভেন্ট', *আমরা অপেক্ষা করছি, রচনাসংগ্রহ*-২ : ১৪৪)

ঙ. একটা হাত শায়েলার কাঁধের কাছে শাড়ি আর ব্লাউজ বাম-থাবায় চেপে ধরে মুহূর্তের মধ্যে চেয়ার থেকে তাকে তুলে ফেললো। ... ঠিক তখুনি শায়েলা আর তার মাঝখানে এক মূর্তিমান যুবশক্তি এসে মামুনের কাঁধে হিংস্র ধাতব একটি রদ্দা মেরে বললো, আবে আমলার বাচ্চা, বাড়িত যা, খানিক বাদে আইস্যা নিয়া যাস, এক আধটা ফ্রি সার্ভিস দিলে কি হইবো– পইচ্যা যাইবো তর বৌ? ... কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছো, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? তখন দুটি হাত তাকে জড়িয়ে প্রায় পিষে ফেললো। মাটি থেকে উঠে গেল তার দুটি পা– অতি কঠিন একটি হাত নির্মমভাবে নিংড়ে দিল তার একটি বুক আর তার মুখের উপরে ঝুঁকে এলো একটি খোঁচা খোঁচা দাঁড়িভরা দুর্গন্ধযুক্ত মুখ। ... চুপ মাগি, গলা টিইপ্যা শ্যাষ কইরা দিমু, সতীপনা রাইখ্যা দে। অবশ হয়ে এলো শায়েলার শরীর। মুখে মুরগী নিয়ে শেয়াল যেমন ঝোপের আড়ালে যায় ঠিক তেমনি করেই সাততলা বাড়ির পুবদিকের দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকার ঝোপের তলায় তাকে নিয়ে ঢুকে গেল লোকটা। ('পাবলিক সার্ভেন্ট', আমরা অপেক্ষা করছি, *রচনাসংগ্রহ*-২ : ১৪৯)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজবাস্তবতায় নারী-জীবনের বহুমাত্রিক জীবন অভিধার পরিচয়টি সমাজসত্যের আলোকে উন্মোচিত হয়েছে। বিশ বছরের চাকুরি জীবনে মামুন নামক আমলার পৃথিবীর বহু দেশ ঘোরার প্রসঙ্গে তার বহু নারীর সংস্পর্শে আসার বিষয়টিও গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের প্রমাণও মেলে তার সোফার ভাঁজ থেকে খুঁজে পাওয়া দীর্ঘ সোনালি চুলের মধ্য দিয়ে। এহেন তথাকথিত লম্পট বহুগামী আমলার কাছে তাই স্বাভাবিকভাবেই নারীদের 'শুয়োপোকার দল' মনে হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। তাছাড়া মামুনের নিকট শায়েলার চিরাচরিত কোমল-শান্ত চেহারাটাই পরিচিত ও কাম্য, প্রতিবাদমুখর নারীর স্বরূপ তার বিবেচনাতেই স্থান পায় না। কেননা :

সমাজ নারীর মধ্যে এমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিতমান্যতা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, পুরুষ নির্যাতন করার অধিকারী এবং নির্যাতন সহ্য করা নারীর কর্তব্য, এই বোধ জাগ্রত করে নারীকে প্রতিবাদ বা প্রতি আক্রমণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। ... নারীর উপর পুরুষের ক্ষমতা দমননীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দমননীতি পুরুষের ক্ষমতার উৎস। (মাহমুদা, ২০০২ : ৩০)

সমাজ-প্রসূত সেই ক্ষমতার দম্ভে মামুন রশীদের হাত স্বাভাবিকভাবেই তাই স্ত্রী শায়েলাকে শায়েস্তা করার মানসে নিশপিশ করে *ওঠে*। এটা কেবল গল্পের কোনো পটভূমি বা দৃশ্যপট হিসেবেই বিবেচিত হয় না বরং আমাদের সমাজবাস্তবতায় মামুন রশীদের মতো পুরুষ চরিত্রের এই আচরণ নিতান্ত প্রাত্যহিক একটি বিষয় হিসেবেই যেন পরিগণিত হতে পারে। শায়েলার উপর নেমে আসা ভয়াবহ পাশবিক অত্যাচারের যে বিবরণ আলোচ্য গল্পে বিধৃত হয়েছে তা প্রকারান্তরে সমাজবাস্তবতার অসার, হতাশাখিন্ন ও অবক্ষয়-পীড়িত নিদারুণ সময় ও পরিপ্রেক্ষিতকেই প্রতিবিম্বিত করে তুলেছে। শায়েলার ধর্ষণের ঘটনাটিকে অবাস্তব মনে করার কোনই কারণ নেই। যদিও শায়েলার ঘটনা, বিশেষ করে এরকম পুলিশ প্রহরায় পরিবেষ্টিত একটি সভার প্যান্ডেলে, বাঘা-আমলা স্বামীর পাশের সিট থেকে চিলের মতো ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে গিয়ে কাছাকাছি বিল্ডিংয়ের আড়ালে ধর্ষণ করার ঘটনাটাকে অনেকটাই অস্বাভাবিক বা নাটকীয় মনে হতে পারে কিন্তু :

> তিরাশি সালের রাষ্ট্র-লালিত গুণ্ডা বাহিনীর দর্প-দাপট ও দেশের আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেবার বা বলা চলে সরকারের মৌন সম্মতিতে আইনকে তাদের হাতে তুলে দেবার কারণে দেশ কিভাবে শাসিত হয়েছিলো, ভয়াবহ সেইসব অবস্থার কথা স্মরণ করলে শায়েলা বা কৃষক কন্যা বা পুত্রবধূর ধর্ষণের ব্যাপারটাকে, তা সে স্বামী, পিতা, শ্বশুর– যার সামনেই হোক না কেন, শোকাবহ এমন পরিণামকে মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। (জাফর, ১৯৯৬ : ১২৮-১২৯)

প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় নারী ধর্ষণের ভয়াবহতা পাঠকের সচেতন বিবেকবোধকে বিমূঢ় না করে পারে না। যদিও একথা মনে রাখতে হবে যে : "পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা ন্যূনতম। নারী নির্যাতনের ঘটনা সাধারণত গোপন করা হয়; জনসমক্ষে প্রচার হতে দেওয়া হয় না। প্রকৃত ঘটনার তুলনায় তাই প্রকাশিত ঘটনার সংখ্যা নগণ্য।" (মাহমুদা, ২০০২ : ৩১) ধর্ষিতা রমণী সমাজে পতিতা; ধর্ষণের কথা জানাজানি হলে তার স্থান হয় পতিতালয়ে যেখানে তাকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। কাজেই ধর্ষিতা নারীর আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা ঘটনা চাপা দেন। ধর্ষিতা নারী নিজেও ঘটনা গোপন করতে চায় কেননা : "ধর্ষণ গুরুতর অপরাধ হলেও প্রমাণ করা কঠিন। ধর্ষিতাকে নিশ্চিত প্রমাণ দিতে হবে যে, ধর্ষণে তার সম্মতি ছিল না এবং সে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করেছিল। ... নির্যাতিত মহিলার জন্য আদালতে হাজিরা বাস্তব ধর্ষণের মতো সংকটপূর্ণ।" (মাহমুদা, ২০০২ : ৩২-৩৩) নারীর প্রতি পাশবিকতার জঘন্য বর্বরতার দৃশ্যপটের আলোকে আলোচ্য গল্পে সমাজবাস্তবতায় নারী নিগ্রহের চিরায়ত স্বরূপটিকেই প্রকারান্তরে উন্মোচিত করা হয়েছে অসাধারণ সমাজ-মনস্ক শৈল্পিক দক্ষতায়।

রোদে যাবো

হাসান আজিজুল হকের সপ্তম গল্পগ্রন্থ *রোদে যাবো*। *রোদে যাবো* গল্পগ্রন্থে সংকলিত মোট আটটি গল্প যথাক্রমে 'রোদে যাবো' (১৯৬৮), 'বাইরে' (১৯৬৮), 'খুব ছোট্ট

নিরাপদ নির্জন' (১৯৮২), 'ঝড়', 'নবজাতক' (১৯৭৪), 'নিশীথ ঘোটকী' (১৯৮০), 'ভূতের কষ্ট' (১৯৮২), এবং 'কোথায় ছোবল' (১৯৭৯)। বিভিন্ন সময়ে লেখা ও প্রকাশিত গল্পগুলোকে সেগুলোর প্রকাশকাল ও রচনাকালের সময় ও পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে এবং সেই সময় ও পরিপ্রেক্ষিতের সূত্রে সমাজজীবনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমির অনুষঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নৈরাজ্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নৈতিক বিচ্যুতি, বুর্জোয়া শ্রেণির দাস্য মনোবৃত্তি, সামরিক শাসকের লোকদেখানো সংস্কার প্রচেষ্টা হাসান আজিজুল হকের *রোদে যাবো* গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর বিচিত্র পরিসরে যেমন রূপায়িত হয়েছে তেমনি এরই সমান্তরালে শিল্পিত হয়েছে নারীজীবনের নানামাত্রিক সমস্যা, সঙ্কট, সম্ভাবনা তথা যাপিত জীবনের বহুমাত্রিক খুঁটিনাটি দিক। 'খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন' গল্পটি আবর্তিত হয়েছে জনৈক জাঁদরেল লেখক ও তার বড়ো বোনের কথোপকথনকে উপজীব্য করে। বড়ো বোন অনেকদিন থেকেই অসুস্থ, রীতিমত বাড়াবাড়ি অবস্থা, তাছাড়া নিজের বাড়িতে ভদ্রমহিলা একরকম একাই থাকতেন। স্বামী মারা গেছেন দীর্ঘদিন আগে। অসুস্থ সেই বড়ো বোনকে দেখতে আসার সূত্র ধরে বড়ো বোনের বাড়িতে জাঁদরেল লেখকের আগমন ঘটে। বড়ো বোন ও লেখকের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়ে পড়ে দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নানামাত্রিক প্রসঙ্গ। গল্পে সমাজবাস্তবতার বহুমুখী জীবনচর্যার অবয়বে বিম্বিত হয়েছে নারী-জীবনের বিশেষ মাত্রা। সমাজে, পরিবারে নারীর জগতটি কেমন করে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে ওঠে, পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত ছকে নারীর ভাবনা-চিন্তাও ধীরে ধীরে কীভাবে সংকুচিত গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তারই পরিচয় আলোচ্য গল্পে লেখকের বড়ো বোনের কথোপকথন-সূত্রে শিল্পিত হয়েছে এভাবে :

> আমি বাইরে খুব কম গেছি রে! জীবনে প্রায় বেরই হলাম না ঘর থেকে– কি আর দেখবো! বললাম না, জীবনটা কাটলো ছোট্ট ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো। তেমন ভালোও না, মন্দও না। কি রকম যেন ভাত ভাত স্বাদ– আলুনি। ... একদিন সন্ধ্যের চমৎকার পোশাক পরা, খুব, খুব দামি সেন্ট মাখা, ফুলকাটা চাদর বিছিয়ে বিছানায় হাত-পা এলিয়ে বিশ্রাম নেওয়া আর গান শোনা– এই ধরনের ব্যাপার হচ্ছে আমার জীবন। ভালোটা কি বুঝতে পারি না– খারাপ বা কি তাও বুঝি না। ('খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন', *রোদে যাবো*, *রচনাসংগ্রহ-২* : ১৮৮)

লেখকের বড়ো বোনের ভাবনায় প্রকারান্তরে গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিজাত পুরুষতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপটি যেখানে :

> নারীর ক্ষেত্রে, পিতৃতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে যা ভাল তাকে মন্দ আখ্যা দেয় এবং প্রকৃতপক্ষে যা মন্দ তাকে ভাল আখ্যা দেয়। মেয়েরা চটকদার পোশাক পরিধান করবে, প্রসাধনে নিজেকে আবৃত করবে, সুগন্ধী মেখে দেহের স্বাভাবিকতা ঢেকে রাখবে।

> এভাবে পুরুষের পছন্দ মোতাবেক তারা নিজেদের কৃত্রিম জড় পদার্থে পরিণত করবে। অপরদিকে, বাস্তব, স্বাভাবিক নারী যারা নিজেদের স্বকীয়তায় অটল থেকে দেহ ও মনকে পিতৃতান্ত্রিক রং ও গন্ধে রঞ্জিত করতে নারাজ তারা সমাজে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত থাকবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এভাবেই কৃত্রিম নারীকে ভাল বলে বাহবা দেবে– এ সবই নারীকে পিতৃতন্ত্রের খাঁচায় পুরে রাখার ফন্দী। (মাহমুদা, ২০০২ : ৭৭)

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'ঝড়' এবং 'নবজাতক' গল্প দুটির পটভূমি মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ নির্যাতন, বিভীষিকাময় দিনরাত্রির অসহ মর্মন্তুদ ইতিহাস ও নারীর প্রতি বীভৎসতার নিদারুণ বাস্তবতা। গল্পগুলোতে বিধৃত নারী-নির্যাতনের লোমহর্ষক বিবরণ পাঠককে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাশবিকতার ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি করে দেয় এভাবে :

> ক. কোথাও কোন শব্দ নেই। হাওয়া বন্ধ। ঘর ভর্তি ঠাণ্ডা হলুদ রোদ। আমি ঘরের ভিতর উঁকি দিলাম। পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। শ্যামলা রং-এর ছিপছিপে কিন্তু পুষ্ট দেহটি। এত তাজা, মনে হয় জ্যান্ত। আমি হয়তো তাই মনে করতাম যদি না দেখতাম দেহটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ঘন নীল রং-এর মোটা কাপড়টি ঘরের এক কোণে জড়ো করা। কালো চুলের গোছা মাথার পিছন দিকে ছড়ানো। মেয়েটির তরুণ শরীরে রোদ। শুধু একটি মাত্র খুঁত। মেয়েটির যোনি নেই। যোনির জায়গায় বিরাট একটি গহ্বর। সেই জায়গাটিতে রোদ যেতে পারেনি। কালো, ঘন কালো বিরাট গর্ত। অনেক গোলাপ বা অনেক পাথর চাপা দিয়েও গহ্বরটি বোজানো যাবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু এটা কোন কথাই নয়। সেই মেয়ের পুষ্ট স্তন দুটির একটি ছোট হাতের মুঠো দিয়ে টিপে ধরে অন্যটি চুষছে বছরখানেক বয়সের হৃষ্টপুষ্ট একটি শিশু। ছোট ছোট হাত দিয়ে থাবড়া মারছে, মুখ ঘষছে, গরুর বাছুরের মতো ঢুঁ মারছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। তার ছটি দাঁত। চোখ কুঁচকে ছটি দাঁত বের করে সে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। ('ঝড়', রোদে যাবো, রচনাসংগ্রহ-২ : ১৯৫-১৯৬)
>
> খ. আমি নদীর নিচের দিকে যতদূর চোখে চলে তাকিয়ে থেকে আমার তপ্ত কপাল আর ভাপে ভরা চোখ ঠাণ্ডা করে নিতে চাইলাম। তখন আমর বাঁ দিকে বড় ঝোপটা থেকে বিকট চিৎকার এলো। এই রকম চিৎকার আমি জীবনে শুনিনি। ... আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম ঝোপের নিচে খালটায় একটি স্ত্রীলোক বসে রয়েছে। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে একটি ফোঁটা রক্ত নেই, চটচটে আঠার মতো ঘামে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। সে তার গায়ের জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখতে পেয়ে আবার এমন চিৎকার করে উঠল যে আমি দু'পা পিছিয়ে এলাম। চিৎকারটি দেবার পরেই সে কোঁকাতে শুরু করে, তার কপালের দুপাশের নীল শিরা আর গলার সব কটি রগ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। সে এক টানে তার ভীষণ ময়লা শাড়িটা খুলে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিলে আমি তার সম্পূর্ণ উদোম চেহারা দেখার আগে সেই নিচু জায়গাটায় এক কলসি কাঁচা রক্ত দেখতে

> পেলাম। মেয়েলোকটি রক্তের মধ্যে নিতম্ব ডুবিয়ে বসেছিলো। এবার সে ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে আমাকে কোন রকমে বললো, বাবা আমার সন্তান হবে– আমাকে বাঁচাও বাবা। ভয়ানকভাবে চমকে উঠেই আমি অসহায় আর বিপন্ন বোধ করতে থাকি। ... এক ঝাঁক প্লেন উড়ে এলো। রাস্তার পশ্চিম দিকে তিনবার বোমা পড়লো। মেয়েলোকটি যেন ঘুমের মধ্যে থেকে আমার দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলে আর একবার বললো, আমাকে বাঁচাও। ('নবজাতক', রোদে যাবো, রচনাসংগ্রহ-২ : ১৯৭-১৯৮)

মুক্তিযুদ্ধকালীন এহেন বিভীষিকাপূর্ণ পরিস্থিতিকে কোনো আখ্যানভাগেই পুরোপুরি তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। কেননা এ স্তব্ধতাকে, এ অমানবিক নির্মমতাকে কোনোভাবেই বর্ণনা করা যায়না। তবে এহেন প্রতিকূলতার মধ্যে নারীর জীবন আরো বেশিমাত্রায় সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছিলো। নারীর জীবনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ছিলো বহুমাত্রিক। কেননা :

> একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে নিজে ধর্ষিতা হয়ে তার সামাজিক অবদান হারিয়েছে, নির্যাতনের শিকার হয়ে সে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু শহীদের সম্মান লাভ করতে পারেনি, কিংবা শহীদের তালিকায় তার স্থান হয়নি, আবার শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মা, বোন কিংবা স্ত্রী হিসাবেও তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। পরিবারের প্রধানকে হারিয়ে অনেক মা-বোন-স্ত্রী নিঃস্ব হয়ে সমাজে মানবেতর জীবন যাপন করেছে। (শাহনাজ, ২০০৭ : ০৮)

অতএব আলোচ্য গল্পগুলোর পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গটির অবতারণার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে নারীর বহুমুখী অবদানের ক্ষেত্রটিকেই প্রতিবিম্বিত করা হয়েছে অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা ও জীবনঘনিষ্ঠ চেতনার আলোকে।

মা-মেয়ের সংসার

হাসান আজিজুল হকের অষ্টম ও *রচনাসংগ্রহ*-২-এর অন্তর্ভুক্ত সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ *মা-মেয়ের সংসার*। গল্পগ্রন্থে সংকলিত মোট সাতটি গল্প যথাক্রমে 'সম্মেলন', 'মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছে', 'মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত', 'বিলি ব্যবস্থা', 'ঘের', 'জননী', এবং 'মা-মেয়ের সংসার'। *মা-মেয়ের সংসার* গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'বিলি ব্যবস্থা' বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের দুটো প্রত্যক্ষ সত্যকে ধারণ করেছে। জোতদার কর্তৃক খাস জমি ভাগ এবং ফতোয়াবাজি বা অবৈধ সন্তান ধারণে নারীর শাস্তির বিধান— এই দুই ঘটনা গল্পটিকে প্রবহমান করেছে। গল্পের নেক বখ্‌শ গ্রামের জোতদারের অধীনস্থ কামলা। গ্রামের অ-বণ্টিত খাস জমিতে একবার সে সরিষার চাষ করে; কিন্তু পরিশ্রমের এই ফসল সে নিজ ঘরে তুলতে পারে না, জোতদারের হুকুমে ফসল কেটে তার ঘরে দিয়ে আসতে নেক বখ্‌শ বাধ্য হয়। অন্যদিকে নেক বখ্‌শের একমাত্র ছোটবোন নেকী বোবা। জোতদারের খোঁড়া ও নুলো ছেলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠায় নেকী একসময়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। নেক বখ্‌শ জোতদারের নিকট তার ছেলের সঙ্গে নেকীর বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে

প্রত্যাখাত হয়। উপরন্তু প্রমাণহীনতার সুযোগ নিয়ে জোতদার গ্রাম্য শালিসের মাধ্যমে নেকীর উপর ফতোয়া জারি করে। কোমর পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে অগণিত পাথর নিক্ষেপে রক্তাক্ত করে ফেলা বা এই প্রক্রিয়ায় তাকে হত্যা করার বিধান নিশ্চিত করে নেকীকে গর্তে রেখে পাথর ছোঁড়া শুরু হয়। এভাবেই গল্পের পরিসরে খাস জমি বণ্টনের নামে প্রহসন, গ্রাম্য জোতদারের তথা ক্ষমতাবানের অসহায়-দরিদ্র শ্রেণির মানুষের প্রতি শোষণ-নিপীড়ন, গ্রামীণ ফতোয়াবাজি তথা ধর্মের নামে অধর্ম সৃষ্টিকারীদের মুখোশ অত্যন্ত বাস্তবনিষ্ঠ ও মর্মস্পর্শীরূপে আলোচ্য গল্পে বিশ্লিষ্ট হয়েছে। এরই সমান্তরালে আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর প্রকৃত সত্তার যথার্থ স্বরূপটিও উন্মোচিত হয়েছে সমাজসত্যের আলোকে। পুরুষ, তা সে খোঁড়া কিংবা নুলো যেরকমই হয়ে থাকুক না কেন, সমাজে তার আসনটি বেশ সম্মানজনক স্থানেই থাকে। যে কোনো নারীর প্রতি কামনার লোলুপ দৃষ্টি ফেলতে পুরুষের বিন্দুমাত্রও বেগ পেতে দেখা যায় না। সমাজ পুরুষকে বহুগামিতার অবাধ সুযোগ দিয়ে রেখেছে। এ যেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এক অলিখিত নিয়তি। প্রকারান্তরে নারীর বেলায় একেবারেই বিপরীতধর্মী চিত্র লক্ষণীয়। কেননা : "নারীর দেহসৌষ্ঠব তার নিজস্ব; কিন্তু পুরুষ তা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের ভোগের বস্তুতে রূপান্তরিত করেছে। ... নিজের সন্তুষ্টি নয়, পুরুষের সন্তুষ্টি বিধান নারীর যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য। পুরুষ নারীকে উপভোগ করবে— এটাই নারীর নিয়তি।" (মাহমুদা, ২০০২ : ১২) নেক বখ্শের বোবা বোন নেকী সেই নারী-জীবনেরই প্রতিচ্ছবি যারা প্রতিনিয়ত পুরুষের লালসার শিকার হয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্য দিয়ে জীবনের নির্মমতাকে প্রত্যক্ষ করে চলেছে। সমাজ এহেন নারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। অথচ যে পুরুষ সমাজ গর্হিত আচরণের অন্যতম ভূমিকায় অবতীর্ণ — সে রয়ে যায় সমস্ত বিচার-আচারের ঊর্ধ্বে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নিজের অপকর্মের দায়ভার নির্ভারচিত্তে পুরুষ নারীর উপর চাপিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। গল্পটি সেই সমাজসত্যকে ধারণ করেছে এভাবে :

> শেষ পর্যন্ত খাস জমির জায়গাটাই ঠিক হলো। মালিক একদিন নেক বখ্শকে ডেকে পাঠায়, কি কহে রে লোকে! বিচার তো এলা করিবা লাগে। ... নেক বখ্শ এইবার একবার ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে, আমার বুন কি করিছে মালিক, কথাই তো কহিবার পারে না, আপনের ছোঁয়া–, মালিকের আর সহ্য হয় না, মোর ছোঁয়ার নাম আর একবার মুখে আনিবি তো তোর কল্লা ধড় থাকি নামি দেইম শালা!
>
> খাস জমির মাঝখানে নেক বখ্শ গর্ত করা দেখছে। ... মালিকের ল্যাংরা নুলো ছেলেটা আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ঢাউস পেটের উপর নোংরা ছেঁড়া শাড়ি চাপা দিয়ে নেক বখ্শের বোন নেকী আনমনে মাঠের দিকে চেয়ে থাকে। ... ঘরের মেয়ে বেশ্যা হইবার ধরিছে, বেশ্যা হইতেছে ঘরের জেনানা। এইসব ভীষণ আক্ষেপ করতে করতে ইমাম সাহেব লাফ দিয়ে এসে নিজের হাতে কোদাল তুলে নিয়ে মাটি খোঁড়ায় হাত লাগায়। ... মুখ খিস্তি করে চেঁচিয়ে ওঠে ইমাম, কি বাহে, তুমরা মজা দেখিবার নাগিছ, খানকি মাগীক গর্তত ফ্যালে পুঁতি দাও। ভয়ে ভয়ে রোগা পটকা

> তিন চারটে লোক এগিয়ে আসে, মালিকের নুলো ছেলেটাকে একবার ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিতে দেখা যায়। ... নেকীকে কোনমতে গর্তে টেনে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে স্থির শান্ত হয়ে গেল। নেকী এইবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাঁয়ের লোকদের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। মাটি-মাখানো মুখের উপর ভেসে-ওঠা তার কটা চোখের তারা, বসন্তকালের বিকেলবেলায় কোকিলের চোখের তারার মতো, সেই চোখ দিয়ে চরাচরের দিকে তাকাতেই ছাই-ছাই ধোঁয়া-ভরা আলোয় মাঠ-ঘাট-আকাশ ঢেকে গেল। পাথর তোলো, ইট তোলো, পাথর ছোঁড়ো, ইট ছোঁড়ো বাহে, মারো হারামজাদি খানকিকে– ইমাম সাহেব জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। ... জেনাকারীর লাল রক্ত যে মুসলমান চোখে দেখল না সে আবার কিসের মুসলমান। শক্ত, তিনদিকে ধারঅলা একটা ঝামা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে এরে রে রে ও হো চিৎকার করে ইমাম নেকীর কপালে মারল। ... রক্ত এর মধ্যেই কালো হয়ে এসেছে, নেকীর ডান হাত বেয়ে কনুই থেকে গড়িয়ে নামছে নিঃশব্দ একটা ধারা। ('বিলি ব্যবস্থা', মা-মেয়ের সংসার, রচনাসংগ্রহ-২ : ২৬০-২৬২)

ধর্মের অজুহাতে, ধর্মবোধকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে স্বীয়-স্বার্থ হাসিলের জঘন্য, হীন, অপকৌশল হিসেবে এভাবেই ফতোয়াবাজি হয়ে ওঠে নারীকে অবদমনের পুরুষতান্ত্রিক হাতিয়ার।

দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে জীর্ণ এক কুমারী মায়ের আখ্যান 'জননী' গল্পে বর্ণিত হয়েছে। মাতৃত্বের স্বাদ, মায়ের দায়িত্ব ও অধিকারবোধ এ গল্পে ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। এ গল্পে দেখা যায়, কথকের ফ্ল্যাটবাড়িতে আয়েশা নামের এক সুন্দরী যুবতী ঝিয়ের কাজ নেয়। একদিন এক প্রতিবেশীর কথায় কথকের স্ত্রী জানতে পারে মেয়েটির সন্তান আছে কিন্তু সে অবিবাহিত। দুই মাস পরে কথকের স্ত্রী আয়েশার পুনরায় গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করে তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে চায়। এরও প্রায় দুমাস পরে একরকম বাধ্য হয়েই আয়েশাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। পথের মাঝে আয়েশাকে মাঝে মাঝে দেখে কথকের মায়া হয়, একসময় ঝরঝরে শরীর দেখে কথক তাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন তার সন্তান নেই। আয়েশার তৃতীয়বার গর্ভধারণ সম্পর্কে জানতে পেরে কথক আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি লক্ষ করেন যে এবার আয়েশার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত জীবনযাপন সত্ত্বেও আপন গর্ভকে অস্বীকার না করে সন্তান প্রসবের জন্য আয়েশা অপেক্ষা করে। আরো কিছুদিন পর কথক শীর্ণকায়, বিধ্বস্ত আয়েশার কাছে তার সন্তান সম্পর্কে জানতে চেয়েও কোনো সদুত্তর পান না। কথক বুঝতে পারেন, পরবর্তী সন্তান ধারণের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করছে। প্রকৃতপক্ষে, ঘটনা যা-ই হোক না কেন, জননীর মাহাত্ম্য বর্ণনাই আলোচ্য গল্পের মূল উপজীব্য। বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন এক কুমারীর জননী পদে উন্নীত হওয়ার মহত্ত্বকেই হাসান আজিজুল হক সহৃদয়তার সঙ্গে এ গল্পের পটভূমিতে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। আয়েশা বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় সেইসব অসহায়

নারীর প্রতিবিম্ব যারা প্রতিনিয়ত পুরুষের পাশবিক লোলুপতার শিকারে বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে সমাজে অবাঞ্ছিত হিসেবে পরিগণিত হয়। অথচ নারীর এহেন দুর্দশার জন্য নারী মোটেই দায়ী হতে পারে না। দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাত, পুরুষের বিকৃত লালসার কাছে নারী একরকম উপায়হীন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয় পতিতা নারীর জীবন বেছে নিতে। গল্পে সমাজবাস্তবতার সেই নির্মম সত্যের রূপায়ণ ঘটেছে এভাবে :

> এ মেয়েটি আমাদের মেয়েটিরই মতো। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা বাষ্প আমি কিছুতেই ঠেলে ভিতরে পাঠাতে পারি না। কথা বন্ধ হয়ে যায় আমার কথার মাঝখানে।
>
> কি বললে? আমাদেরই মেয়ের মতো? খেপে গেলে নাকি? একটা রাস্তার বদস্বভাব মেয়ে, জন্মের পর থেকে পুরুষসঙ্গ করছে–
>
> সেই হারামজাদা শুয়োরের দল, পুরুষ শুয়োরদের বুঝি কোনো দোষ নেই– রাগে চিৎকার করে আমি গলা চিরে ফেলি। সে তো তোমরাই– স্ত্রীও চেঁচিয়ে ওঠেন।
>
> সে তো আমরাই– চকিতে একটা কঠিন সত্য লোহার শাবলের মতো কপালের ঠিক মাঝখানে আঘাত করে। ('জননী', মা-মেয়ের সংসার, রচনাসংগ্রহ-২ : ২৭৪-২৭৫)

গল্পে কথকের চিন্তায় কুমারী জননীর পরিশুদ্ধতা ধরা পড়েছে। বস্তুত গল্পের অবয়বে লেখক প্রকারান্তরে যেন এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, : "বিবাহপূর্ব বা বিবাহ-পরবর্তী যে কোন অবস্থায় নারীকেই সন্তান জন্মদান করতে গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। পৃথিবীর কঠিন-কঠোর বাস্তবতার পাশে সন্তান জন্মদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নারীর অবদান অসামান্য।" (সরিফা, ২০১২ : ১০৮) আর সে কারণেই নারীর মর্যাদা বা সম্মান এতো ঠুনকো কোনো বিষয় হতে পারে না যে তা কতিপয় লম্পট চরিত্রের 'পুরুষ শুয়োরের দল' কর্তৃক পদদলিত হতে পারে। মাতৃত্ব নারীর মর্যাদাকে নানামাত্রায় সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত করে। এ কথাও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে : "নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ সে সন্তান ধারণ ও জন্ম দিতে পারে। তার গর্ভ আর শরীরকে ঘিরেই মানবপ্রজন্মের বেড়ে-ওঠা এবং বংশরক্ষা।" (মাসুদুজ্জামান, ২০১২ : ৪৩২) তাছাড়া আয়েশার তৃতীয়বারের সন্তান জন্মদানের পর বিপর্যস্ত শীর্ণ শরীরে কথক বাংলাদেশের খাঁজকাটা মানচিত্র দেখতে পান। জননী এক্ষেত্রে যেন জন্মভূমির মতোই বিপর্যস্ত। জননী এ গল্পে জন্মভূমির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। চরিত্রের প্রতীকীকরণের মধ্য দিয়ে এবং জননীকে জন্মভূমিতে রূপান্তর করায় গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ শৈল্পিক মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'মা-মেয়ের সংসার'। গল্পে মা-মেয়ের জীবনালেখ্যর অবয়বে জানা যায় যে, জলের নাগাল থেকে একটু দূরেই থাকে মা আর মেয়ে। কেবল তাই নয় বরং বলা যেতে পারে সমাজ থেকেও তারা দূরেই অবস্থান করে। দূরবর্তী এক

নিজস্ব সংসার তাদের। সে সংসারের দৈনন্দিনতা মেলে না সমাজের অন্য সবার সঙ্গে। তাদের ঘরের পিছনের বেনাঝোপে শিয়াল থাকে। কিন্তু শিয়াল শুধু ঝোপে বা বনে থাকে না। মা-মেয়ের সংসারের চারপাশে মানুষের মাঝখানেই ঘোরাঘুরি করে 'মনুষ্যরূপী শিয়াল'। এক সন্ধ্যায় চারজন এসে মেয়েকে মুখে গামছা বেঁধে নিয়ে যায় গোলপাতার বনে, চারটি পুরুষের তথা মানুষরূপী শিয়ালের ক্রমাগত ধর্ষণে জ্ঞানহারা পড়ে থাকে মেয়ে। একটু পরে নিজেদের ঘরে মাকেও সেই একই পরিণতিতে পৌঁছতে হলো— এই হলো মা-মেয়ের জীবন, এই হলো তার বৃত্তান্ত। সমাজ থেকে দূরবর্তী হলেও সমাজ ঠিকই থাবা বাড়ায় মা-মেয়ের দিকে। কাজেই তাদের সমাজ থাকতেই হয়, তারা সমাজে না থাকলেও। গল্পপাঠে মনে হতে পারে লেখক এ গল্পে যেন শুধু দর্শক, যেন শুধু বলে যাওয়াই তাঁর কাজ, এর বাইরে তিনি কোথাও নেই। কিন্তু সচেতন ভাবপ্রত্যয়ে ধরা পড়ে যায় যে : "আছেন গল্পকার হাসান আজিজুল হক, গল্পের পরতে পরতে যিনি মিশিয়ে দিতে পারেন ছকহীন সমাজ বাস্তবতাকে, অন্যদিকে গল্পের নির্মাণে তৈরি করে দেবেন এক চাপা উৎকণ্ঠা, যে উৎকণ্ঠার সঙ্গে মিশে যাবে ক্লেদের অভিজ্ঞতা।" (ইরাবান, ২০১২ : ৬৬) গল্পের মধ্যে রিপোর্টারের নির্মোহ ভঙ্গির মধ্যেই অনুভূত হয় নিষ্ঠুরতা — সে নিষ্ঠুরতা এক বাঁকা বিদ্রূপের। মা ও মেয়ের যৌথ জীবনযাপন প্রত্যাখ্যান করে প্রচলিত প্রথাবদ্ধ সমাজের অচলায়তনকে, সমাজের মাতব্বরিকে, এমনকি আল্লাকেও। এই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যান করা হয় চাপিয়ে-দেওয়া নানা মূল্যবোধকে। যে মূল্যবোধের পাকে পাকে জড়ানো থাকে নানা ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা এবং আত্মপ্রতারণা। বলা যায় বার বার মরতে মরতে মৃত্যুকেও শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করে মা-মেয়ে। মা-মেয়ের প্রতি সামাজিক অনাচার, নেমে আসা ফতোয়াবাজির খড়গ, প্রচলিত প্রথাবদ্ধ সামাজিকতার বিপরীত মেরুতে মা-মেয়ের অবস্থান নেয়া বা বিরুদ্ধাচরণ— প্রভৃতি বিষয়ের মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের নানামাত্রিক সঙ্কটকে প্রমূর্ত করে তোলা হয়েছে সমাজসত্যের আলোকে। আলোচ্য গল্পের কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য :

> ক. গাঁয়ের কিছু লোক মা-মেয়ের বাড়িতে আসে। এসব কি হতিছে– ওদের একজন প্রথমে মায়ের পেটের দিকে, তারপর আধন্যাংটো মেয়ের ফুলে ওঠা তলপেটের দিকে দেখায়। মা গাঁয়ের লোকেদের দিকে তাকায়। তোমার পোলার নাম মহম্মদ না? যে প্রশ্ন করেছিল তার দিকে ফিরে শুধোয় মা। তোমার পোলার নাম আশেকালি না, তোমার পোলার নাম কামাল না, আর তোমার পোলার নাম চেরাগালি না? মা আর তিনজনের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে। আমাদের পোলার নাম শুনে তুমি করবা কি? যা কই জবাব দাও। হাঁড়ি খাইয়ে চলে গেলি বেড়াল চেনবা? ... ওসব ফালায়ে দাও পেটের থে, না হলি সোমাজে থাকতি পারবা না। জেনা করলি সোমাজে থাকা যায় না। ... আল্লার আইন মানতি হবে সগ্‌গলের। আল্লার সঙ্গে তোমাগে কথা হয়? হ্যাঁ, হয়। সে বিটা কি হয়?

> খবরদাড় ছিনাল মাগী, মুখ সামলে কথা কবি। সে বিটা কি কয় জানা নেই না! কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতি পাথর ছুঁড়ে খতম করতি হবে তোদের। সেই বেবস্থাই কর গে তোমরা। তোমাদের পোলাগুলারেও নিয়ি আসবা। ওদের মাটিতে পোঁতবা মাথা থিকে কোমর ইস্তক। আল্লা নেই, তাই আল্লার কথা কচ্ছো। থাকলি এতক্ষণে ঠাঠায় পুড়ে কেলায়া থাকতা। ('মা-মেয়ের সংসার', মা-মেয়ের সংসার, রচনাসংগ্রহ-২ : ২৮৩)
>
> খ. অনেক রাতে চাঁদ পুরোপুরি ঘরে ঢুকে গেলে মা আস্তে আস্তে মেয়েকে জাগায়, এইবার ওঠ্ মা, দানোটারে বাইরে শিয়েলের মুহে দিয়ে আয়। ও বাঁচে থাকলি কাল আমি জাউরা পুরুষজাতটারে দেহাতাম আমরা পারি ফুল ফোটাতি। গু-মুতের মদ্যি যারা গলা পর্যন্ত ডুবোয়ে বসে থাকে, গু-মুতের স্বপ্ন দ্যাখে, তাদের দ্যাহাতাম। ... বঙ্গোপসাগরের হাঙরেরা অপেক্ষায় থাকে। মা-মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমায়। ('মা-মেয়ের সংসার', মা-মেয়ের সংসার, রচনাসংগ্রহ-২ : ২৮৫-২৮৯)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চালচিত্র। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বিধৃত হয়েছে নারীর প্রতি সামাজিক অবদমনের সেই ভয়াবহ নির্মম চিত্র। উপায়হীন মা-মেয়ের মতোই সমাজের অগণিত মা-মেয়ের প্রতি তথা নারীর প্রতি অবহেলা-নিপীড়নের মর্মন্তুদ দৃশ্যপটের বাতাবরণে উন্মোচিত হয়ে পড়ে সেই সমাজসত্য যেখানে : "অবহেলিত-অসহায় নারী যদিও সমাজের বাইরে থেকেই তাদের মতো করে বাঁচতে চায়, কিন্তু তাদের প্রান্তিকতা সমাজ মনে করে প্রয়োজনীয় আবর্জনা মাত্র, ব্যবহার করে যাকে ছুঁড়ে ফেলা যায়। ... পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার অধিকার প্রসারিত করতে চায় সমাজের বাইরে বেরিয়ে আসা মা-মেয়ের উপরেও।" (ইরাবান, ২০১২ : ৬৭) যদিও গল্পটিতে মা তার প্রতিরোধের ভাষায় সমাজের অবদমনকে, নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়া স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ফতোয়াকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'জাউরা পুরুষজাতটারে দেহাতাম আমরা পারি ফুল ফোটাতি' এহেন সংলাপের দৃঢ়তায় মায়ের তথা নারীর দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়ে প্রকারান্তরে নারীর মাতৃত্বের অপার সম্ভাবনার ইতিবৃত্তকেই যেন প্রতীকায়িত করা হয়েছে। প্রচলিত প্রথাবদ্ধ সমাজবাস্তবতার অসার-ঠুন্‌কো পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে নিজস্ব নিয়মে প্রত্যাখ্যান করে মা-মেয়ে, যদিও "এই প্রত্যাখ্যানে তারা উল্‌টে দিতে পারে না প্রথাকে, নিয়মকে, কিন্তু তাদের সাজানো বয়ানের অসারতাকে প্রতিপন্ন করে দিতে পারে। প্রত্যাখ্যানের এই ভাষা সরব নয়, ইঙ্গিতময়।" (ইরাবান, ২০১২ : ৬৮) প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে আলোচ্য গল্পে বর্ণিত মায়ের প্রতিবিম্বে নারীর এই যে প্রত্যাখ্যান বা এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ানো, মনে হতে পারে, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর এহেন বিপ্রতীপ অবস্থান তো বাস্তব সমাজচিত্র নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই নারী সাধারণ কোনো নারী নয়, লেখকের প্রজ্ঞা আর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে এহেন প্রতিবাদী নারী সত্তা। কেননা একথা অনস্বীকার্য যে : "নারীকেই হতে হবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা এবং পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারী পুরুষ উভয়ে

মিলে হবে সমাজের ভাগ্য নিয়ন্তা। জাগ্রত নারীই পারে যাবতীয় বৈষম্যের প্রতিকার চাইতে এবং পুরুষের অধীনতা পাশ ছিন্ন করতে।” (মাহমুদা, ২০০২ : ৪১) নারী জাগ্রত হবে, আত্মজাগরণের অভীপ্সায় আদায় করে নেবে আপন অধিকার — এই আশাবাদই আলোচ্য গল্পের নারী-জীবনের অবয়বে রূপায়িত হয়েছে অসাধারণ শৈল্পিক কুশলতায়।

হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের নানামাত্রিক পরিসরে নারীচিত্রণ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর নারী-চরিত্রেরা খুবই বাস্তব এবং জীবনসংলগ্ন। আমাদের চেনাজানা পরিধির বহু নারী চরিত্র সব একটা বিশেষ আবেদনে বাস্তবতার অনুষঙ্গে পরিণতি বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছোটগল্পের পটভূমিতে। তাঁর গল্পমালায় যেন নারীচরিত্র বর্ণময় মিছিল। কুলটা বাগদি বৌ থেকে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহিণী, অসহায় দুঃসাহসী গ্রাম্য প্রেমিকা থেকে শহরের বিষণ্ন উদ্বাস্তু ছাত্রী, নিঃসঙ্গ শিক্ষিকা থেকে বিকারগ্রস্ত পতিতা, স্বামী পরিত্যক্তা রমণী থেকে মুক্তিযোদ্ধার ক্ষুধাভীতা পলাতকা ঘরণী — ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে এরা নির্মিত হলেও এদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিচিত্র ব্যক্তিসত্তা আছে, আছে ব্যক্তিত্বও। এরা এদের মতো করে ভাবে; জীবনের জটিল অঙ্কে এইসব ভাবনা যদিও প্রায়শই কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না তবু তারা অসম্ভব জীবন্ত, তাদের নিশ্বাসের স্পর্শ পাঠকেরা পেয়ে যায় এবং পাঠকের বোধের দরজা খুলে সেখানে সমাজবাস্তবতায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক, জটিলতা, পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত সমাজে নারী-জীবনের নানামাত্রিক ছবি উন্মোচিত হয়ে পড়ে সমাজসত্যের অনুষঙ্গে। মানবযাত্রায় নারীপুরুষ পাশাপাশি রয়েছে। বিষয়টি এতটাই স্বাভাবিক যে, লেখার সময়ে হাসান আজিজুল হক পৃথকভাবে কেবল নারীদের নিয়েই তাঁর ভাবনাকে জারিত করেননি এবং সেটা সম্ভবপরও নয় বরং সমাজবাস্তবতার যথার্থ স্বরূপটিকে উন্মোচনের প্রয়োজনেই তাঁর গল্পের বিচিত্র পরিমণ্ডলে রূপায়িত হয়েছে নারী-জীবনের বহুমাত্রিক চালচিত্র। লেখকের মতে :

> আমার এসব লেখা নারীবাদী লেখা নয়, নির্বিশেষে নারীকেন্দ্রিকও নয়। সব নারীই নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাঁধা। এদের নিয়ে কেউ তত্ত্বের ছাঁচে ফেলুক তা আমি চাই না, বরং নাকের নিচে বাস্তবটা দেখুক — এই আমি চাই। সমাজ-সংসার-রাষ্ট্র-অর্থনীতি-রাজনীতি কাদের উপর তীব্রতম প্রহার চালায় তা যে-সব লেখায় দেখাতে চেয়েছি সেগুলোই বোধহয় নারীকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। আমার ধারণা এটাই বাস্তব যে, অন্তত আমাদের এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় (নিজের দেশের কথাই বলছি) নারীরাই সবচেয়ে উপদ্রুত, সবচেয়ে নিঃস্ব, সবচেয়ে বঞ্চিত, অপমানিত, অধিকারচ্যুত। গোটা সমাজের বঞ্চনা দেখাতে গেলে এটাকেই সামনে আনা দরকার। এখানে হাহাকার, মারণাহতের আর্তনাদ, তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্র-শাসকদের রাজনীতি-অর্থনীতি-ক্ষমতার উপর ধিক্কারের থুথু পড়ে।(হায়াৎ, ২০১১ : ১১৩-১১৪)

ছোটগল্পের পটভূমিতে রূপায়িত নারী-জীবনের আলোকে লেখক প্রকারান্তরে ঘুণে ধরা, অবক্ষয়পীড়িত সমাজের রুগ্‌ণ-ভঙ্গুর চিত্রটি উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। হাসান আজিজুল হক নিজেই বলেছেন : "আমার কাছে বার বার মনে হয়েছে, আমাদের এই অসম্ভব সমাজের চেহারাটা যদি লেখায় তুলে ধরতে পারি তাহলে যাঁরা সুস্থতার সন্ধান করছেন তাঁদের বলতে পারবো — না, এই অবস্থাটা চলতে দেয়া যায় না। এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের পুরোপুরি নিরাময় হওয়া দরকার।" (হাসান, ২০১১ : ৯০) সার্বিক বিবেচনায় এ কথা বলা যেতে পারে যে, হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের বিচিত্র পটভূমি ও পরিসরে রূপায়িত বহুমাত্রিক নারী-জীবনের যথার্থ সমাজবাস্তবতা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে কেবল সমাজের প্রকৃত চেহারাই প্রতিবিম্বিত হয় না বরং এরই সমান্তরালে নারীর প্রকৃত অবস্থানটিও সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে; একই সঙ্গে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যথার্থ পথ পরিক্রমারও নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। নারীমুক্তি না-ঘটলে যে বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়, সে-কথাই প্রকারান্তরে ব্যক্ত হয়েছে হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে রূপায়িত নারী-জীবনের নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে। ফলে গল্পগুলো একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সমাজ-বাস্তবতার দালিলিক প্রমাণ ও নারীর মানবিক মুক্তির অনন্য শব্দভাষ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আজহার ইসলাম (১৯৯৬)। *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২. আবু জাফর (১৯৯৬)। *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৩. ইরাবান বসু রায় (২০১২)। 'মা-মেয়ের সংসার : প্রত্যাখানের গল্প'। *গল্পকথা* [সম্পা. চন্দন আনোয়ার] হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩। পৃ. ৬৬।

৪. চঞ্চলকুমার বোস (২০১২)। 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : নির্মিত জীবনের কলকবজা'। *গল্পকথা* [সম্পা. চন্দন আনোয়ার] হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩। পৃ. ৮৯।

৫. দেবশ্রী ভট্টাচার্য (২০১২)। 'অবক্ষয়ের আখ্যান : হাসান আজিজুল হকের গল্প'। *গল্পকথা* [সম্পা. চন্দন আনোয়ার] হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩। পৃ. ১৬৮।

৬. ফজলুল হক সৈকত (২০১২)। 'হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের পরিবেশনশৈলী'। *গল্পকথা* [সম্পা. চন্দন আনোয়ার] হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩। পৃ. ১৩৬।

৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১২)। 'ছোটগল্পের শিল্পরূপ : হাসানের আত্মজা...'। *গল্পকথা* [সম্পা. চন্দন আনোয়ার] হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩। পৃ. ৭১।

৯. বিকাশ রায় (২০১২)। 'দেশভাগের গল্প : হাসান আজিজুল হকের সৃজনী চৈতন্য'। *গল্পকথা* [সম্পা. চন্দন আনোয়ার] হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩। পৃ. ১৫৩।

১০. মাহমুদা ইসলাম (২০০২)। *নারীবাদী চিন্তা ও নারী-জীবন*। জে.কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

১১. মাসুদুজ্জামান (২০১২)। 'নারীর জীবন নারীর গল্প : সেলিনা হোসেন'। *হালখাতা* [সম্পা. শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত] বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা। পৃ. ৪৩৪।

১২. মালেকা বেগম (১৯৮৯)। *বাংলার নারী আন্দোলন*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

১৩. উদ্ধৃত, শাহনাজ পারভিন (২০০৭)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৪. সরিফা সালোয়া ডিনা (২০১২)। 'হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে 'উত্তরবঙ্গ' '। *গল্পকথা* [সম্পা. চন্দন আনোয়ার] হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩। পৃ. ১০১।

১৫. হাসান আজিজুল হক (২০১১)। *বাচনিক আত্মজৈবনিক*। মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৬. হাসান আজিজুল হক (২০০১)। *রচনাসংগ্রহ-১*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

১৭. হাসান আজিজুল হক (২০০১)। *রচনাসংগ্রহ-২*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

১৮. হায়াৎ মামুদ [সম্পা.] (২০১১)। *উন্মোচিত হাসান*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।